গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি

দুর্গা বাসু

710

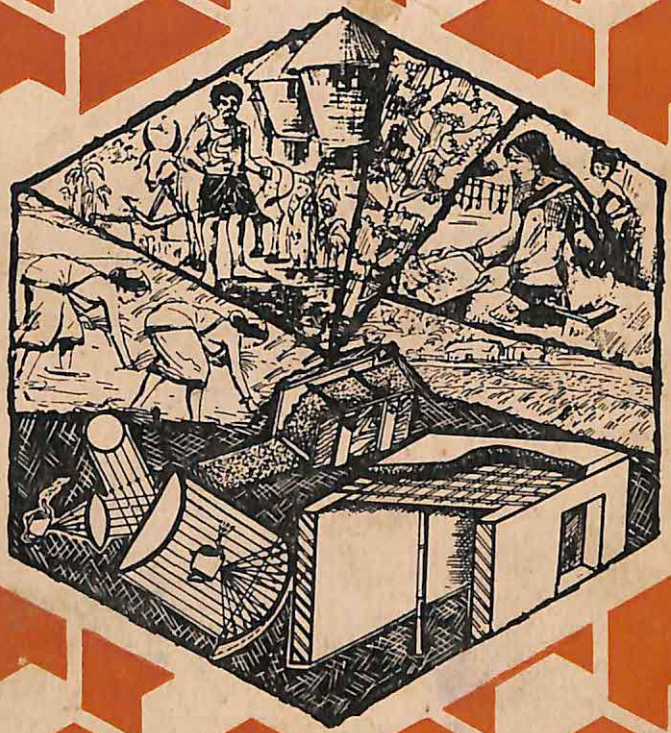

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

3414
8.5.87

4015
8.5.87

গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি

দুর্গা বসু
বি. আর্চ (ক্যাল), এফ. আই. আই. এ., এ. আই. আই. ডি.

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
24/3, B. C. Road

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

GRAM PUNARGATHANE PRAJUKTI

Durga Basu

© WEST BENGAL STATE BOOK BOARD

প্রকাশকাল :

ডিসেম্বর, ১৯৮২

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

আর্য ম্যানসন (নবম তল)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার

কলিকাতা-৭০০০১৩

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 8-5-87
Acc. No. 3414 4015
A Bam

মুদ্রাকর :

শ্রীসুধাতোষ বসু

৩৩বি মদন মিত্র লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল দাস

শ্রীদুর্গা রায়

[সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional language at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

উৎসর্গ

আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ
আমার স্বর্গীয় পিতা ৺সন্তোষকুমার বসুর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

—দুর্গা বসু

"তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্র বহ্নি বন্দিত,
তব বস্তু বিশ্ব বক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্ন-বিজয় পন্থ।
তব লৌহ গলন শৈল দলন
অচল চলন মন্ত্র
কভু কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ়
ঘন পিনদ্ধ কায়া
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ—
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চ ভূত-বন্ধন কর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

—রবীন্দ্রনাথ

সূচীপত্র

॥ ভূমিকা ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

একটি স্বীকৃতি / একটি হুঁশিয়ারী ঝ—ণ

সরকারী নিয়ম (ঝ) * ডঃ দাসগুপ্তর মন্তব্য (ঝ) * বননাশ, কৃষি, জনবৃদ্ধি, শিল্পবিপ্লব (ঞ) * কার্বন ডাই-অক্সাইড (ঞ) * আধুনিক কৃষি ও ভূমিদূষণ (ট) * পরিবেশ সঙ্গত চাষ ও ন্যূনতম সেচ (ঠ) * ভূমিক্ষয় রোধ (ড) * জ্বালানী নির্বাচন (ণ) * শিল্প ও কৃষির পুনর্বিনিয়োগ (ণ)।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১. প্রস্তাবনা ১—১৪

কোলকাতার উন্নয়ন (১) * পঞ্চায়েতী রাজ (২) * গ্রামীণ প্রযুক্তি (৩) * আলোচনার কাঠামো (৪) * আঞ্চলিক প্রকল্প (৭) * গ্রামীণ আবাসন (৮) * বিকল্প জ্বালানী (৮) কুটির শিল্পে প্রযুক্তি (৯) * কৃষি ও বনজ সম্পদ শিল্প (১০) * জৈবশিল্পে প্রযুক্তি (১১) * কৃষি প্রযুক্তি (১২) * পরিবেশ দূষণ (১৪)।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

২. আঞ্চলিক প্রকল্প ১৫—৩৬

সমীক্ষা ও প্রশিক্ষণ (১৬) * জল সরবরাহ (১৮) * নলকূপ (২১) * স্বাস্থ্যবিধি ও জলনিষ্কাশন (২৬) * ডি. ডি. টি. [স্প্রে] (২৭) * ফিনাইল (২৮) * বন্যারোধক প্রকল্প (২৮) * পথ ও যান-বাহন (৩২) * পরিবেশ দূষণ দমন (৩৪) * কৃষি প্রকল্প [আঞ্চলিক] (৩৫) * মূল্যায়ন (৩৬)।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

৩. গ্রামীণ অবসান ৩৭—৬৫

নকশা (৩৮) * বিকল্প মালমশলা (৪১) * উন্নত মানের কুটির (৪৩) * ভিত (৪৬) * দেয়াল (৪৬) * প্লাষ্টার (৪৯) * দরজা-জানলা (৫০) * ছাদ (৫২) * সিলিং (৫৬) * জল সরবরাহ (৫৬) * শৃচি ব্যবস্থা (৫৭) * গরমে ঘর ঠাণ্ডা (৬২) * ঝড়ের বিরুদ্ধে (৬৩) * অগ্নি প্রতিরোধক চাল (৬৩) * ভূকম্পে অটুট কুটির (৬৪) * দূষণের হাত থেকে বাঁচা (৬৪)।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

৪. ধন সম্বল ৬৬—৭৬

জনগণনা (৬৬) * নবতর ধনসম্বল পরিকল্পনা (৬৬) * শিল্প নির্বাচন (৬৭) * শিল্প সমবায় (৬৮) * শিল্প পরিবেশ সৃজন (৬৯) * শিল্প বিন্যাসের রূপরেখা (৭১) * পুন-বিনিয়োগ (৭৩) * সেচ প্রযুক্তি (৭৪) * কৃষি প্রযুক্তি (৭৪) * উচ্চ বনাম মধ্য ফলন শীল চাষ (৭৫)।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

৫. বিকল্প জ্বালানী ৭৭—৯৪

কয়লার সঞ্চয় (৭৭) * তৈল ভাণ্ডার (৭৭) * জলশক্তি (৭৯) * ভূগর্ভ তাপ (৮০) * শেষ বিকল্প (৮১) * জ্বালানী গ্যাস ও অ্যালকোহল (৮১) * জলশক্তি ও বায়ুশক্তি (৮৪) * সৌর শক্তি (৮৬) * সৌরচুল্লী (৮৭) * সৌর-বিদ্যুৎ (৯১) * খড়-কুটো-পাতা (৯২) * জ্বালানীর তুলনামূলক মান (৯৩)।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

৬. কুটির শিল্প ৯৫—১০১

নির্বাচন পদ্ধতি (৯৫) * শিল্প সমবায় (৯৬) * সাবান শিল্প (৯৭) * কাগজ ও বোর্ড (৯০) * চকশিল্প (৯৮) * মৃৎশিল্প (৯৮) * মেয়েদের উপযুক্ত শিল্পসমূহ (৯৯) * ছোট বড় শিল্পের সমন্বয় (১০১)।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

৭. জৈব শিল্প ১০২—১১৩

জৈব শিল্পের সংজ্ঞা (১০২) * মহিষ পালনে শ্বেত বিপ্লব (১০৩) * খাঁচায় মুরগী পালন বনাম ডীপ লিটার (১০৪) * বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ (১০৭) * মৎস্যকেন্দ্রিক শিল্প ও মৎস্য সংরক্ষণ (১১০) * অ্যালগি কালচার (১১২) * চর্ম ও ও সংশিষ্ট শিল্প (১১৩) * হিমায়িত মাংস (১১৩)।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

৮. কৃষি শিল্প ১১৪—১২১

অভক্ষ্য তেল (১১৪) * ভোজ্য তেল / ঘানি (১১৪) * শস্য ভানাই ও পেশাই (১১৪) * সুতী খাদি (১১৬) * ঔষধি (১১৬) * বেত ও বাঁশের কাজ (১১৬) * মাদুর পাপোষ কার্পেট ইত্যাদি (১১৭) কাঠের কাজ (১১৮) * খড় ও খান্দসারী শিল্প (১২০) * পশুখাদ্য (১২১)।

সহায়তার স্বীকৃতি ১২২—১২৩

চিত্র / নকশা / চার্ট

চিত্র (প্লেটের অ্যালবামে) : ৯৬

১নং—যান্ত্রিক লঙ্গল * ২নং—মৃৎশিল্প-মেসিনপ্রেসে * ৩নং—মাটি টালি শুখানো * ৪নং—ধর্মগোলা * ৫নং—বাঁশের দেয়াল ও বোর্ড * ৬নং—অ্যাসবেষ্টসের ছাদ * ৭নং—বায়োগ্যাস প্লান্ট * ৮নং—উইণ্ড মিল * ৯নং—ছাতা তৈরী * ১০নং—ডীপ লিটার মুরগী খামার * ১১নং—মৌমাছি পালন * ১২নং—নারকেল ছোবড়া থেকে পাপোষ।

নকশা :

১নং—ভানাই যন্ত্র ও পালিশ মেসিন (১১) * ২নং—মেসিনে কৃষি অগ্রগতি (প্লেট অ্যালবাম) * ৩নং—শস্য বোঝাই যন্ত্র (১৩) * ৪নং—মাটি কেটে খাল (১৮) * ৫নং—মাটি ভরে

খাল (১৯) * ৬নং—মাছ চাষের পুকুর (২০) * ৭নং—টিউবওয়েল (২১) * ৮নং—প্রকল্পায়িত গ্রাম (৩০) * ৯নং—বাঁধের উপর রাস্তা (৩২) * ১০নং—জমি কেটে রাস্তা (৩৩) * ১১নং—গ্রামীণ বাড়ীর প্ল্যান (৩৮) * ১২নং—গ্রাম বাস্তুর নির্মাণ শৈলী (৪০) * ১৩নং—ছুরমুশ পেটানো মাটির দেয়াল (৪১) * ১৪নং—বাঁশের কাঠামো (৪২) * ১৫নং—ইটের ছাদ (৪৪) * ১৬নং—উন্নত কুটির (৪৫) * ১৭নং—চ্যাটায়র লাদ-প্লাষ্টার দেয়াল (৪৭) ১৮নং—৮ ইঞ্চি দেয়াল ধাপে ধাপে (৪৮) * ১৯নং—৮ ও ১০ ইঞ্চি দেয়ালের তুলনা (৪৯) * ২০নং—দরজার চৌকাঠ (৫১) * ২১নং—খিল আটকানোর কৌশল (৫৩) * ২২নং—বাঁশের রি-ইনফোর্সড ছাদ ঢালাই (৫৫) * ২৩নং—কুয়া পায়খানা (৫৭) * ২৪নং—নলকূপ পায়খানা (৫৮) * ২৫নং—অ্যাকোয়া প্রিভি (৫৯) * ২৬নং—অ্যাসবেষ্টস সেপ্টিক ট্যাঙ্ক (৬১) * ২৭নং—জনতা বায়োগ্যাস প্লান্ট (৬১) * ২৮নং—ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা (৬৩) * ২৯নং—কয়লার সঞ্চয় (৭৭) * ৩০নং—তেলের সঞ্চয় (৭৮) ৩১নং—গ্রামীণ কোল্ড ষ্টোর (৮৮) * ৩২নং—সৌর তাপের প্রতিফলন (৮৯) * ৩৩নং—সূর্যমুখী সৌর চুল্লী (৯০) * ৩৪নং—মুরগীর খাঁচা (১০৪) * ৩৫নং—আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত ঢেঁকি (১১৫)।

চার্ট ঃ

গ্রামীণ পরিকল্পনার কাঠামো (৫) * নলকূপের গভীরতা (২৩-২৫) * অগ্নিরোধক খড়ের চাল (৫৩-৫৪) * সেপ্টিক ট্যাঙ্কের মাপ (৬০) * পরিপূরক কৃষি--শিল্প--পশুপালন সাইকেল (৬৮) * পুনর্বিনিয়োগ (৭২) * শক্তি ব্যবহারের তুলনা (৯২) * জ্বালানীর তুলনামূলক শক্তিগত মান (৯৩) খাঁচা ও ডীপলিটারে মুরগী পালনের তুলনা (১০৫-১০৬) ঢেঁকিছাটা বনাম মিল ছাঁটা চাল (১১৫) * ঔষধি গাছ (১১৭) * কাঠের নাম, গুণ, ব্যবহার (১১৯-১২০)।

প্রকাশক সরকারী নিয়মমাফিক পাণ্ডুলিপিটি মূল্যায়নের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডঃ বিপ্লব দাসগুপ্তের কাছে। ডঃ দাসগুপ্ত নিছক দায়সারা ভাবে মূল্যায়ন করেন নি। সাত মাস ধরে তিল তিল করে গবেষকের মত রচনা করেছিলেন সতেরো পাতা ব্যাপী এক অতি গঠনমূলক সমালোচনা। লেখক মাত্রের নিজের লেখার সমালোচনাকে নির্দয় মনে হয়। আমিও ব্যতিক্রম নই। তবু আমার মনে হয়েছে পাঠকবর্গের পূর্ণ অধিকার রয়েছে আমার লেখার পাশে পাশে এই চিন্তাধারা সমূহ জানতে পারার। মনে হয়েছে এই টিকাটিপ্পনী আমার লেখার ভুল ত্রুটি শুধরে চিন্তাশীল পাঠককে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করবে। আমি ব্যক্তিগত জীবনে একজন বাস্তকার। আমার অর্থনীতির জ্ঞান পি. ডব্লু. ডির' আইটেম রেট কণ্ঠস্থকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ডঃ দাসগুপ্তর মত আন্তর্জাতিক মানের একজন ইকনমিষ্টের কাছ থেকে পাওয়া অর্থনৈতিক আলোচনাগুলি বেমালুম আত্মসাৎ করেছি বইটি পূর্ণতর রূপ লাভ করবে বলেই। স্বয়ং কবিগুরুই তো বলেছেন যে ভাবের ঘরে চুরি করলে দোষ নেই।

ডঃ দাসগুপ্তর যে মন্তব্য আমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে তা হল :

"পারিপার্শ্বিক নিয়ে আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু বইয়ের বিভিন্ন অংশে যেন আলোচনাটা কিছুটা অবিন্যাস্ত ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন একটা জায়গায় একসঙ্গে আলাদা পরিচ্ছেদ করে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে আলোচনা হলে হয়ত ভালো হোত। বিশেষ করে বলা প্রয়োজন ছিল যে কেন আজকে আমরা পারিপার্শ্বিক চেতনার কথা বলছি। প্রকৃতিগত ভারসাম্য (ecological balance) recycling non-renewable সম্পদের ব্যবহার, বন সংরক্ষণের সঙ্গে বন্যা ও চাষের সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনার প্রয়োজন আছে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রয়োজন কিভাবে পারিপার্শ্বিকের আলোচনা এবং প্রযুক্তি বিদ্যার আলোচনা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয় এবং বলা যে কোন প্রযুক্তি বিদ্যাকে পারিপার্শ্বিক-নির্ভর হতে হবে।"

প্রয়োজন তো বটেই, কিন্তু এসব কথা বলতে হলে যে এলেমের দরকার হয়!

পৃথিবীতে কৃষিবিদ্যার চলন ও সেই সাথে জলসেচন ও বনজঙ্গল সাফাই শুরু হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৬০০০ সালে। পৃথিবীর লোকসংখ্যা তখন মোট এক কোটি। ষ্টীম ইঞ্জিনের উদ্ভাবন ও শিল্পবিপ্লব এলো এর পৌনে আট হাজার বছর বাদে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। পৃথিবীর লোকসংখ্যা তখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটিতে। ১৯৫০ নাগাদ বিজ্ঞান মানুষকে উপহার দিতে শুরু করল উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, গভীর নলকূপের জলে অঢেল সেচ ব্যবস্থা—এক কথায় সবুজ বিপ্লব। জনবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল ফসলের উৎপাদন (মোট পার্থিব লোকসংখ্যা তখন ৩৫০ কোটির মত)। ২০০০ সালে এই লোকসংখ্যা এর ডবল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। এই ভয়াবহ হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নানান সমস্যার সঙ্গে জন্ম নিল আর এক নতুন সমস্যা—পরিবেশ দূষণ।

কলকারখানা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল সেখান থেকে বেরিয়ে আসা দূষিত গ্যাস ও শিল্প আবর্জনা যা আকাশ বাতাস নদ-নদী জলাশয়কে দূষিত করে তুলতে লাগল। শিল্প বিপ্লবের শুরু অবধি প্রকৃতির তুলনায় মানুষ ছিল সংখ্যালঘু। তাদের দেহ ও শিল্প থেকে নির্গত দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিত পৃথিবীর বনজ সম্পদ, অনায়াসে। ফিরিয়ে দিত বিশুদ্ধ অক্সিজেন। এইভাবে প্রকৃতি রক্ষা করত পরিবেশের ভারসাম্য।

কিন্তু মানুষ যতই বাড়তে লাগল, পৃথিবীর বনজ সম্পদ ততই কমতে লাগল। জঙ্গল পরিষ্কার করে সৃষ্টি করা হতে লাগল নতুন নতুন গোচারণ, কৃষিক্ষেত্র, জনবসতি, শিল্পাঞ্চল। বিগত হাজার বছরে ইউরোপের অরণ্যভূমি ৭০ শতাংশ থেকে কমে ২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান প্রাণিজগত ও শিল্প-সমষ্টি থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে চলেছে মাত্রাহীন ভাবে অন্যদিকে বন-সঙ্কোচনের দরুন সেই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে পরিশোধন করে অক্সিজেনে রূপান্তর করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা কমে আসছে নিদারুণ ভাবে। ফলং—বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের এক ঘন থেকে ঘনতর আবরণ। কাঁচের মত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভিতর দিয়ে আলোক-রশ্মি পার হয়ে যায় স্বচ্ছন্দে। আবার ঠিক কাঁচের মতই এই গ্যাস আটকে দেয় তাপ রশ্মিকে। ফলে পৃথিবীতে পতিত সূর্যালোকের প্রতিফলিত তাপ বেরোতে পারছে না। সারা পৃথিবীটাই হয়ে উঠছে একটা

বিরাট কাঁচঘর বা তাপঘর (Glass house বা hot house—যেমন থাকে বটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিড বা ক্যাকটাস গাছ ফলাতে।)……বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেড বেড়ে যাবে। বিপদ আসবে দু-তরফা—এক, অনাবৃষ্টি আর খরাতে বেড়ে উঠবে মরু অঞ্চল, ফলন কমে গিয়ে দেখা দেবে শস্য-ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি, মৃত্যু আর দুই, মেরু দেশের বরফ গলে ফুলে উঠবে সমুদ্র, দেখা দেবে বিধ্বংসী বন্যা, ভূমিনাশ এবং শেষে সেই একই ফল—প্রাণিগোষ্ঠীর মৃত্যু।

প্রাণিদেহে রক্তের শোধন প্রক্রিয়ায় এবং মূলতঃ শিল্পের জৈব জ্বালানী (খনিজ তেল, কয়লা, কাঠ ইত্যাদি) থেকেই এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের জন্ম। তবে পরিবেশের ভারসাম্যে এই বৈষম্য সৃষ্টিতে শিল্পই একমাত্র আসামী নয়। আধুনিক কৃষিপদ্ধতিও সমানভাবে দায়ী, যদিও এক ভিন্নতর পন্থায়।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রথমতঃ কৃষি জমির ঘাটতি মেটাতে জঙ্গল কেটে সৃষ্টি করা হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের। এতে দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে অরণ্য অঞ্চলের গাছপালা, যারা গ্রহণ করত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও উদ্গীরণ করত অক্সিজেন। বনাঞ্চল সঙ্কোচনে শিল্প ও জনবসতি প্রসারের থেকে কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণ ক্ষেত্রের প্রসারণই অধিক দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে অতি ফলনশীল উন্নত বীজ, যার চাষে প্রয়োজন অজৈব সালফেট ও ফসফেট জাতীয় নাইট্রোজেন-ঘটিত সার, ডি. ডি. টি. জাতীয় কীটনাশক, প্রচুর সেচ (যার চাহিদা প্রাকৃতিক উপায়ে মেটানো অসম্ভব; বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে এবং বড় গভীর নলকূপের সাহায্যেই একমাত্র এ চাহিদা মেটানো যায়।) এই সার ও কীটনাশক ফলনে আপাত চমকের সৃষ্টি করলেও দীর্ঘমেয়াদী কুফল হিসাবে জমিকে ধীরে ধীরে লবণাক্ত করে অনুর্বর করে তুলেছে। অতি সেচেও জলের সঙ্গে বাহির হয়ে আসছে নানান দুষ্ট লবণ। বিশেষতঃ গভীর নলকূপের জল তুলে আনছে খনিজ লবণ যা মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে অতি দ্রুত। এইভাবে ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতা চললে অচিরেই আমাদের কৃষি জমি-গুলি রূপান্তরিত হবে লবণাক্ত মরুভূমিতে

বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টিও ক্ষতি করছে আর একভাবে। জলাধারে পলি জমা হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে। ডি. ভি. সি.র মাইথন বাঁধে, বিশেষজ্ঞরা

বলেছিলেন বছরে পলি জমা হবে ৩৪ একর ফুটের মত। দেখা যাচ্ছে পলি জমার প্রকৃত হার ৩০০ একর ফুট। দেশের সব কটি বাঁধেই একই চিত্র। সারা দেশের বাঁধে জমা বাৎসরিক পলির পরিমাণ দিয়ে ২০ ফুট উঁচু ৫ ফুট চওড়া একটা দেওয়াল তৈরী করে দেয়া যায়, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। এই জমা পলি জলাধারের নাব্যতাকে কমিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার পরিধি। নিত্য নতুন জমি পড়ছে জলের কবলে। বাড়ছে বন্যার প্রকোপ, ভূমিক্ষয়। কেবল ভারতেই ১৪০০ লক্ষ হেক্টার জমিতে বিস্তৃত হয়েছে এই ভূমিক্ষয়—যা ভারতীয় কৃষি জমির অর্ধেকের সমান।

এ দেশে বাৎসরিক কীটনাশক ব্যবহৃত হয় ৪,০০,০০০ টন। ফল কি জানেন। বিভিন্ন দেশে মানবদেহে সঞ্চিত ডি. ডি. টি.র হিসাবটা শুনুন :

আমেরিকা / ক্যানাডা—দশলক্ষে ২-৪ ভাগ		এ বিষ আসছে পানীয় জল, মাছ, মাংস, শাক-সব্জী ও শস্যের মাধ্যমে।
ইউরোপ	— „ ৬-৮ „	
ইজরায়েল	— „ ১৯ „	
ভারত	— „ ২৬ „	

আমাদের উত্তর পুরুষদের কানা-খোঁড়া-প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা আমেরিকার তুলনায় দশগুণ, ইউরোপের তুলনায় চারগুণ! আমাদের শিয়রে সংক্রান্তি। পরিবেশ দূষণকে রুখতেই হবে।

এই বন সংকোচন, জমি ও জলের উন্মত্ত চাহিদা, সার ও অষুধের অতি ব্যবহার, শিল্পের অকল্পনীয় প্রসারণ, বসতির আকারে ও সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি এ সবের মূলে রয়েছে জন বিস্ফোরণ এ বৃদ্ধির হার ৫০ কোটি (১ খৃষ্টাব্দে), ৭০ কোটি (১৭৫০ খৃঃ), ১০০ কোটি (১৮৫০ খৃঃ) ২৫০ কোটি (১৯৫০ খৃঃ) ৪০০ কোটি (১৯৭৫ খৃঃ) এবং সম্ভবত ৭০০ কোটি (২০০০ খৃঃ)। বৃদ্ধির এই হারকে শূন্য বা প্রায় শূন্য নামিয়ে আনতেই হবে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

এ ছাড়া,

(১) পরিবেশ সঙ্গত উপায়ে করতে হবে চাষ-আবাদ। মধ্য ফলনশীল বীজ, জৈবিক জীবাণুবাহক (Organic Azobactor) সার, ক্ষতিকর কীটনাশক কীটাণু পালন—এই উপায়ের অন্তর্গত।

(২) ন্যূনতম জলসেচের ও জল বণ্টনের ব্যবস্থাপনা। কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন উদ্ভিদের জল সেচের প্রয়োজন এক এক ক্ষেত্রে এক এক

রকম এবং মাত্রায় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। যেমন ধরুন, ধানচাষে চারাকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এটি দরকার কেবলমাত্র অঙ্কুরোদ্গম ও বীজতলায় বেড়ে ওঠার সময়। ঠিক ৫ সেন্টিমিটার জলের তলায় ডুবে থাকা প্রয়োজন। এইভাবে বেঁটে গম গাছেরও প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সেচ-পরিমিত মাত্রায় ও সঠিক সময়ে। এইভাবে নির্বাচিত বীজ দিয়ে পরিমিত সেচপ্রয়োগে চাষ করলে জলের ব্যবহার অনেক কমানো যায়।

এছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে খাল বা নালার মাধ্যমে যে সেচ হয় তাতে প্রায় অর্ধেক জল খালের মাটি শুষে নেয় বা রোদে বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যায়। অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাষ্টিক নল দিয়ে ফোয়ারা (Sprinkler) বা ফোঁটা ফেলা যন্ত্রের (Drip) মাধ্যমে সেচ দিলে এই অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে। এতে বেঁচে যাওয়া জলের দাম থেকে অল্পদিনেই নল ও যন্ত্রপাতির দাম উঠে আসবে। এই পদ্ধতির চাষকে বলে শুষ্ক চাষ (Dry farming)।

বাঁধের জলাধারের আর এক কুফল হল আশেপাশের ভূতল জলস্তর উঁচুতে উঠে যাওয়া। এর ফলে মাটি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে উঠে, ফসলের গোড়া পচে যায় সহজেই, ক্ষেত থেকে সেচের জল সরতেই চায় না। এমতাবস্থায় আশেপাশের খাল বিল কেটে চাষীরা জমি উঁচু করার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টা প্রচণ্ড ব্যয়সাধ্য। এ চেষ্টা থেকে বিরত থেকে উচিত এমন ফসলের নির্বাচন যা ভিজে মাটিতে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে পারবে এবং যার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করবে না।

(৩) ভূমিক্ষয় রোধ। দক্ষিণ বাংলায় দেখেছি ইট ভাঁটা, বালি খাদ ও মাটির কনট্রাক্টাররা মাইলের পর মাইল আবাদী জমিকে কেটেকুটে নিষ্ফলা করে দিচ্ছে প্রতিবছর নিছক তাদের অন্যায় অর্থলোভে। সাধারণ মানুষ নিরুপায় আক্রোশে ফেটে পড়েন কিন্তু আইন সেখানে নীরব। এ ধরণের ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে আইন হওয়া দরকার। আইনের মাধ্যমে বনভূমিগুলিকেও সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করলে জ্বালানীর প্রয়োজনে নির্বিচারে গাছ কাটা অনেকটা কমবে। যে সব ক্ষেত্র ইতিমধ্যেই লবণাক্ত হয়ে পড়েছে, তার মাটিতে সম্ভব

হলে স্ল্যাগের (লৌহশিল্পের শিল্প আবর্জনা) গুঁড়ো, চূনা পাথরের গুঁড়ো ইত্যাদি মেশাতে পারলে তা আবার আবাদী হয়ে উঠবে। সমুদ্র সংলগ্ন মরুভূমিতে তাপ-পারমাণবিক পদ্ধতিতে সাগর জলকে লবণমুক্ত করে সেচ ব্যবস্থার যে গবেষণা চলছে ভূমিক্ষয় রোধে তার ফল সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

লবণাক্ত ভূমিতে তামাক, গম ও বার্লির চাষ করে দেখা গেছে তাতে ফলনও ভাল হয়, মাটিতে লবণের ভাগও কমে আসে। বনসৃজনের আন্দোলনকে বন (উৎসব, বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) কে সামাজিক ভাবে ও আইনের মারফৎ উৎসাহ দিতে হবে।

ভূমি ব্যবহারের ছবি এক এক জায়গায় এক এক রকম। শিল্পপ্রধান অঞ্চলে কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম। আবার ঠিক উল্টোটা পাওয়া যাবে কৃষিপ্রধান অঞ্চলে। সাইবেরিয়া বা আমাদের রাজস্থানে প্রায় সবটাই অনাবাদী। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাধান্য চারণভূমির, দক্ষিণ আমেরিকায় বনভূমির। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক গড়টা এই রকম দাঁড়ায় :

বনভূমি—	৩৩ শতাংশ	(অনাবাদীর মধ্যে আছে
আবাদী জমি—	৩০ „	মরুভূমি, পার্বত্য অঞ্চল,
চারণ ক্ষেত্র—	১০ „	জনবসতি, বেহড়, ভেড়ি
অনাবাদী—	২৭ „	ইত্যাদি।)
মোট—	১০০ „	

আবাদী ও চারণভূমির চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এখান থেকে কমানোর প্রশ্ন উঠে না—অথচ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বনভূমির আয়তন বাড়ানো একান্তই দরকার।

এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় অনাবাদী অঞ্চলকে বনভূমিতে পরিণত করা। অবশ্য আর একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা হচ্ছে সাগর থেকে ভূমি উদ্ধার (Reclamation)। তবে তা গ্রামীণ প্রযুক্তির আয়ত্তের বাইরে। প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলেই দেখবেন কিছু অনাবাদী জমি পড়ে রয়েছে। গ্রামস্তরের (Microlevel) পরিকল্পনায় এগুলিকে পরিবেশ উন্নয়নের কাজে সহজেই লাগানো যায়, যার ফলস্বরূপ কাজটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক সহজ হয়ে যায়।

(৪) জ্বালানী নির্বাচন। বর্তমান সভ্যতার জ্বালানী হচ্ছে কাঠ, কয়লা, তেল। তিনটিই বায়ুমণ্ডলে মিশিয়ে চলেছে বিষাক্ত গ্যাস। নবতর জ্বালানী (যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে)— সৌর শক্তি, বাতাস, সামুদ্রিক জল ও তাপ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা মত বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ কমতে বাধ্য।

(৫) শিল্প ও কৃষির মধ্যে পুনর্বিনিয়োগ (Recycling—এ বিষয়েও বিশদ আলোচনা আছে ধন সম্বল অধ্যায়ে)। যেমন ধরুন লৌহমল বা স্ল্যাগ হচ্ছে লৌহ শিল্পের বর্জিত আবর্জনা। আগের পাতাতেই জেনেছি তাকে সাফল্যের সঙ্গে পুনর্বিনিয়োগ করা যেতে পারে কৃষি জমিকে লবণমুক্ত করতে। পশু পালনের আবর্জনা থেকে সৃষ্টি করা যায় চমৎকার জৈবসার। কৃষি আবর্জনা থেকে শিল্পের কাঁচামাল (খড় থেকে ব্লক বোর্ড, ভূষি থেকে পশু খাদ্য ইত্যাদি)। এতে শুধু যে অর্থনীতিই চাঙ্গা হবে তাই নয়; অর্থহীন আবর্জনার সদগতি পরিবেশকেও চাঙ্গা রাখবে। এই প্রথায় বিকল্প জ্বালানীও পাওয়া যাবে যাতে করে দীর্ঘায়িত হবে আমাদের জৈব জ্বালানীর ভাণ্ডার (যার সঞ্চয় কমে এসেছে মারাত্মক ভাবে)।

পরিবেশ অনুকূল রাখতে আরো বেশ কিছু প্রযুক্তির উদ্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে যার পুরোপুরি জ্ঞান আমার নেই (আগেই তো বলেছি এ সব লিখতে হলে এলেম দরকার) অথবা সেগুলি গ্রামীণ স্তরে প্রয়োগের অনুপযুক্ত বলে এখানে উল্লেখিত হল না।

মোদ্দা কথা পরিবেশ দূষণ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসছে সিন্ধবাদ নাবিকের মত। তাকে যেন তেন প্রকারেণ ঘাড় থেকে নামাতে আমাদের প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে। এ লড়াই বিজ্ঞানের লড়াই, বিজ্ঞানীর লড়াই। বিজ্ঞান মানুষকে উপহার দিয়েছিল শিল্প বিপ্লব, স্বাস্থ্য বিপ্লব, সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব —এবার দিক পরিবেশ- বিপ্লব। এই কামনা জানিয়ে শেষ করছি এই স্বীকৃত পত্র।

৭এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০০১৩
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২

দুর্গা বসু।

১

প্রস্তাবনা

আজকাল পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, সিনেমায় রেষ্টুরেন্টে একটা চমকদার স্লোগান শোনা যায় প্রায়শই, "কোলকাতার উন্নয়ন করতে হলে থামিয়ে দিতে হবে কোলকাতার উন্নয়ন" (To develope Calcutta, stop developing Calcutta)। শুধু চমক নয়, কথাটার মধ্যে রয়েছে কিছু চিন্তাশীলতার পরিচয়। গত দুই দশকে (৬০ ও ৭০ দশকে)-সি. এম. ডি. এ, সি. আই. টি, অধুনালুপ্ত সি. এম. পি. ও, কর্পোরেশন ও সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোলকাতার বেশ কিছু উন্নতি সাধন করেছেন, এ কথা মানতেই হবে। সে তুলনায় বাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রগতি প্রায় নগণ্য। ফলং ? উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে লোক চলে আসছে কোলকাতায়। তাদের বক্তব্য—কোলকাতার ফুটপাথে শান বাঁধানো মেঝের উপর আছে বাস ষ্টপের প্যাসেঞ্জার শেলটারের পাকা ছাউনী, ষ্ট্রীট লাইটের অকৃপণ আলো, রাস্তার কলের পরিষ্কার জল আর খেটে খেতে তৈরী মানুষের জন্য রুজি রোজগারের কিছু পথ—মাল টানা, মাল বহা, ঠেলা চালানো, বিড়ি বাঁধা, রিকসা টানা, জুতো পালিশ, কাগজের হকারী কিম্বা পশরা ফেরী। মেয়েদের জন্য ঠোঙ্গা বানানো, চাল বিক্রী, ঝির কাজ, পান-বেচা, ভিক্ষে কিম্বা পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যবসা! অর্থাৎ কোলকাতাকে উন্নত করা হচ্ছে ঘন বসতির উপযুক্ত করে। তবে কোলকাতার শহরাঞ্চলের দারুণ উন্নতি হয়েছে, এটাও ঠিক নয়। যেমন গ্রামগুলি তেমনিই ভারতবর্ষের শহরগুলিও প্রচণ্ড গরীব, যদিও তুলনামূলকভাবে শহরের অবস্থা গ্রামের থেকে ভালো। প্রকৃত পক্ষে কলকাতা প্রায় সর্বসম্মতভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব শহর।

তবুও কোলকাতার যেটুকু উন্নতি হয়েছে তাই হাতছানি দিয়ে আনছে ঘনতর বসতিকে যা পর্যায়ক্রমে বানচাল করে দিচ্ছে সব উন্নতিকে। ফিরে আসছে ট্র্যাফিক জ্যাম, ফুটপাত বেদখল, ডাবের খোলায় দমবদ্ধ ভূগর্ভ নর্দমা, আবর্জনার স্তূপ, জলের জন্য হাহাকার, বাসা বাড়ীর লেলিহান ভাড়া, পদে পদে ভিখারী, ছেনতাই, রাহাজানি। সব মিলিয়ে একটা দুষ্টচক্র।

কাজেই দাবী উঠেছে 'উন্নয়ন-বন্ধের'। কোলকাতা নয়, উন্নতি করতে হবে বাকি পশ্চিমবঙ্গের। যাতে সেখানে ফুটপাতের চেয়ে আরামদায়ক শয্যা, প্যাসেঞ্জার শেলটারের থেকে উন্নত আবাস, রাস্তার আলোর থেকে উজ্জলতর রোশনাই, কর্পোরেশনের কলের থেকে আরো ঠাণ্ডা জল, ছিনতাই, ভিক্ষে বা ঝির কাজের থেকে বেশী সম্মানজনক বৃত্তি সেখানের মানুষকে আটকে রাখতে পারে আপন গ্রাম-গঞ্জের গণ্ডীতে। কোলকাতার উপর থেকে ক্রমবর্ধমান বহিরাগতের চাপ এড়াতে না পারলে কোলকাতার স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। অতএব কোলকাতার উন্নতি চাইলে বন্ধ করতে হবে কোলকাতার উন্নতি। চালু করতে হবে সারা পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিকল্পনা। যতই চাই না কেন গ্রামাঞ্চলের বিরাট সংখ্যক মানুষকে এখনো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত একটা বিপুল সুখস্বাচ্ছন্দ্য আমরা দিতে পারব না। কাজেই এ ক্ষেত্রে জোর হওয়া উচিত কৃষিজাতীয় কাজের উপরেই ; এ ছাড়া না গ্রাম না শহর কারও উন্নতি সম্ভবপর নয়।

এ পরিকল্পনার রূপ, স্কেল, হাতিয়ার সবই হবে ভিন্নতর-কৃষিপ্রধান পশ্চিম-বাংলার গ্রামীণ রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। পশ্চিমবাংলায় আজ চালু হয়েছে পঞ্চায়েতী রাজ। ১৫টি জেলা পরিষদের অধীনে ৩২৪টি পঞ্চায়েত সমিতি উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম চালাচ্ছেন ৩২৪২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের মারফৎ। ১৯৭৮-এ এঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭—স্বাধীনতার এই তিরিশ বছর গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যের কোন সুসংবদ্ধ ধারা বা আঞ্চলিক সমন্বয় ছিল না। টুকরো টুকরো উন্নয়ন কর্মসূচী যা ছিল একান্তই বিচ্ছিন্ন ও প্রক্ষিপ্ত-তা হাতে নিতেন সরকারী বিভাগগুলি। জনস্বাস্থ্য, সেচ, পি. ডাবলু. ডি, পথ, জনকল্যাণ, সমবায় বা শিক্ষা দপ্তর আপন আপন সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন-ক্ষমতা মাফিক হাতে নিতেন ছোট ছোট প্রকল্প যার একটির সঙ্গে আর একটির না থাকত কোন সম্পর্ক, না থাকত কোন সমন্বয়। প্রত্যেক বিভাগের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদরা থাকতেন নিজেদের কৃতকাজের আত্মপ্রসাদে বিভোর। গ্রামীণ মানুষ বা সামগ্রিকভাবে আঞ্চলিক সমাজ তার থেকে কতটুকু ফয়দা ওঠাল, তা নিয়ে কারুর এতটুকু মাথা ব্যাথা ছিল না।

কিন্তু যুগ পাল্টে গেছে। শহুরে বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ নয়, গ্রামের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যরা যাঁরা হচ্ছেন ওই সব গ্রামেরই অধিবাসী প্রাথমিক

শিক্ষক, কামার, কুমোর, ছুতোর, বর্গাদার বা প্রান্তিক চাষী—তাঁরাই আজ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করছেন ওই সব উন্নয়নমূলক কাজের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা শাখার জরিপ মাফিক "Of the Panchayet members elected, on over whelming majority, over 80% came from landless labourers, unemployed, share croppers, artisans, school teachers and owner-cultivators and within the owner-cultivators again, over 75% came from the small and marginal farmers."-এ ছবি একেবারে আনকোরা। পল্লী উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গীরও মৌলিক পার্থক্য অনিবার্য।

শুধু যে আঞ্চলিক সমন্বয় সাধন তাই নয়, গ্রামীণ রূপরেখার জন্য চাই এক নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার হাতিয়ার যার নাম গ্রামীণ প্রযুক্তি (Rural Technology)। এ বস্তু আমাদের নিজেদের তৈরী করে নিতে হবে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজনীতি, প্রয়োজন ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। ইউরোপ বা আমেরিকা এ বস্তু ধার দিতে পারবে না তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মারফৎ। টুকরো টুকরো চিন্তা, পরীক্ষা, গবেষণা ও সমালোচনার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে এই প্রযুক্তি বা টেকনোলজী আমাদেরই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বুকে। ইউরোপ ঠাণ্ডা দেশ। তাই সেখানে হার্দিক স্বাগতমকে বলে ওয়ার্ম রিসেপসান। আমাদের স্বর্ষি-হাসা গ্রামে একজন আর একজনকে দেখে গরম হয়ে উঠলে তার মানে হয় অন্য। অর্থাৎ আমাদের প্রযুক্তি আমাদের গ্রামের ভিন্নতর পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী গড়ে নিতে হবে নিজেদের।

এ প্রযুক্তির বিশেষ কিছুই এখনো প্রকল্পকদের হাতে আসে নি। প্রায় সবটাই গড়তে হবে। বর্ণ-পরিচয় স্তর থেকে ব্যাকরণ কৌমুদীর স্তর অবধি। এবং তার পুরোটাই রচনা করতে হবে মাতৃভাষায়। কারণ? কারণ এই প্রযুক্তির যারা মূল বাহক সেই সব পঞ্চায়েত সদস্যদের মাত্র কমবেশী দুই শতাংশের পরিচয় আছে ইংরাজী শিক্ষাধারার সঙ্গে। রাষ্ট্রভাষা পড়নে শকতা হায় আরো কম সংখ্যক। এঁরা বাংলা বলেন, বাংলায় ভাবেন, বাংলায় স্বপ্ন দেখেন। মাতৃভাষা শুধু এঁদের মাতৃদুগ্ধ নয়, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। অতএব আমাদের প্রযুক্তির ভিত্তি হবে বাংলা ভাষা এবং শুরু

করতে হবে একেবারে অ-আ-ক-খ থেকে। কারণ এই সব পঞ্চায়েতীদের প্রযুক্তিগত কোন শিক্ষাই নেই। সরকারী বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদরাও অস্তমিত। পঞ্চায়েতকে সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এক তরুণবাহিনী—গ্রামসেবক ও কর্মসহায়ক দল। এদেরও ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ। অতএব নতুন টেকনোলজিটাকে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া বা দরগার উঠানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার অ-আ-ক-খ থেকেই শুরু করতে হবে। আর বাংলা ভাষাটুকুকেও হতে হবে চলতি গাড়োয়ানী ভাষা, কেতাবি পরিভাষা নয়। 'বাতানুকলকরণ' এর থেকে এয়ার কণ্ডিশান আমাদের বেশী চেনা। ফিলটারের থেকে 'পরিস্রাবক' অনেক ভিনদেশী। 'অন্তকর্তক যন্ত্র' থেকে ড্রিলই আমরা বেশী ব্যবহার করি। ভালব চিনি, 'কপাটিকা' বল্লে বিশ বাঁও জলে। নিউট্রাল তারটা ছুঁতে ভয় পাই না, 'তড়িৎ-উদাসী' তার আমাদের 'শক' মারে। অতএব পরিভাষার কেতাব শিকেয় তোলা রইল। এ বই-এ আমরা যাত্রা করি গাড়োয়ানী ভাষার গাড়ীতে—'হেই হাট হাট' করতে করতে।

পরিকল্পনার মূল ছক বা মাষ্টার প্ল্যানকে দু ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. কাঠামোগত পরিকল্পনা (Physical Planning).

খ. অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning).

গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই দুই ভাগ পরস্পরের পরিপূরক। গ্রামের খাল, বিল, রাস্তা, জলসেচ, জনস্বাস্থ্য ও শুচি ব্যবস্থা (Sanitation), ঘরবাড়ী, থাকবার আস্তানার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রথমটির অন্তর্গত। দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতির পথে প্রযুক্তির প্রয়োগ। অর্থাৎ গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পে নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে একই সঙ্গে খরচ কমানো এবং উৎপাদন বাড়ানো যাতে গ্রামবাসীর আয় ও সঞ্চয় দুই-ই বেড়ে ওঠে নাগরিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শুধু 'অসতো মা সদগময়'ই নয়, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'ও। কেবল ফুল নয়, ফলও। এই দুই পরিপূরক উন্নয়নেই হতে পারে সত্যিকার গ্রামীণ জাগরণ। শান্তিনিকেতনের সাথে চাই শ্রীনিকেতনও। তাই আমাদের প্রযুক্তির খোঁজাখুঁজি ছড়িয়ে দিতে হবে উভয় শাখার পরিকল্পনাতেই।

গ্রামীণ প্রযুক্তির সন্ধানে পরিকল্পনার গভীরে প্রবেশ করলে আলোচনার কাঠামোটা দাঁড়ায় এই রকমঃ

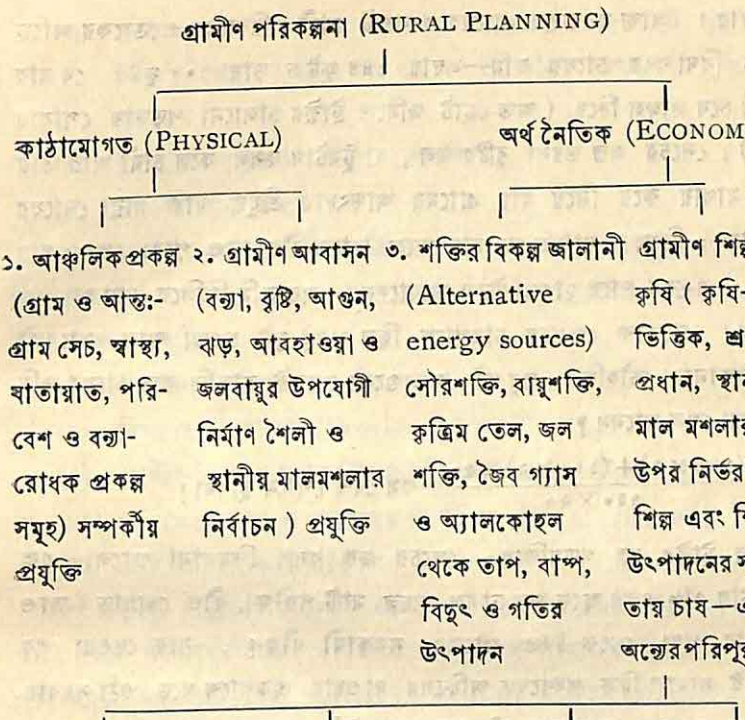

বাজার (উৎপাদনের বিক্রয় ব্যবস্থা), ঋণ, শিক্ষা, ভূমি সংস্কার—এ সবগুলিই সমবায় ব্যবস্থার অন্তর্গত। ধনসম্বল অধ্যায়ের মূল্যায়ণ করতে ডঃ দাসগুপ্তও বলেছেন—সমবায় প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা যায়। বিশেষ করে বাজারের প্রশ্ন, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রশ্ন, ঋণের প্রশ্ন এবং শিক্ষণের প্রশ্ন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যায়। প্রকৃত পক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে আদ্যিকালের আত্মকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে এক নবতর সাম্যবাদী সমাজ চেতনার পথে। এতে করে ব্যক্তি বা পরিবারের প্রাধান্য হচ্ছে অস্তমিত। জীবনের সবদিকে (রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক সামাজিক) যে নতুন ধারা ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে এক কথায় তার ইউনিট বা একক কে বলা চলে সমবায়। এই সমবায়ের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিয়ে এই বইএর মাপে ১০ ভল্যুম লিখলেও তার শেষ পাওয়া যাবে না। যেমন ধরুন ভূমি-

সংস্কার। আত্ম-সর্বস্বপুর গ্রামের পঞ্চাশটি চাষী পরিবারের প্রত্যেকের আছে এক বিঘা করে চাষের জমি—লম্বায় ১৪৪ ফুট চওড়ায় ১০০ ফুট। যে যার জমি চষে লাঙ্গল দিয়ে (অত ছোট জমিতে ট্রাক্টর চালানো পড়তায় পোষায় না); সেচের জন্য ভরসা বৃষ্টির জল; যা টুমটাম ফসল ফলে চাষী আর তার বউ মাথায় করে নিয়ে যায় গ্রামের আড়ৎদার শ্রীযুক্ত দাঁও মারা ঘোষের গুদামে; ভিক্ষের সামিল যে দাম মেলে তাতে বীজধানও পুরো কেনা যায় না। এ হেন গ্রামে হাওয়া উঠল সমবায়ের। সব জমি মিলিয়ে দেয়া হল এক লপ্তে। প্রত্যেক ক্ষেতের চারপাশে ছিল ২।২½ ফুট চওড়া আল—সাবেকী মালিকানার চৌহদ্দি। শুধু এই আলগুলো থেকেই বাড়তি কত চাষের জমি পাওয়া গেল জানেন?

$$\frac{(১৪৪\times২)+(১০০\times২)\times৫০}{১২০\times২০}=\text{কম বেশী পৌনে দুবিঘা!}$$

এবার ট্রাক্টর চল্ল গড়গড়িয়ে; সেচের জন্য বসল তিনখানা স্যালো—এক একটায় ৫/৬ একর জুড়ে জল ঢালল অঢেল, মাটি পরীক্ষা, বীজ যোগাড় (তাও আবার পুষা থেকে-উন্নত জাতের সরকারী বীজ!), সার দেওয়া সব কিছুই সামাল দিল পঞ্চায়েত অফিসের দাওয়ার একপাশে গড়ে ওঠা সমবায় খামার দপ্তর। সমবায়ের ভাঁড়ারে জমে উঠল ফসলের পাহাড়। তারপর একদিন দশ লরী বোঝাই করে ফসলের মিছিল চলে গেল শহরের সরকারী সংগ্রহালয়ে। গ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম কেনাবেচা হল নগদ দামে, ন্যায্য দামে। সাঁঝের মুখে হার্ট অ্যাটাক হয়ে পটল তুল্ল দাঁওমারা ঘোষ। চাষী তখন বউ-এর হাতে আনকোরা লাল ডুরে পাড় শাড়ীটা তুলে দিয়ে আদায় করছে একখিলি পান। কোমরের গেঁজেতে তার একমুঠো দশটাকার নোট। কাল সকালে সমবায় ব্যাঙ্ক খুল্লে জমা করে দেবে তার একাউন্টে। আপাততঃ দাওয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে আওড়াতে লাগল গাঁয়ের বীজমন্ত্র—"ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, হতিনাই হতিনাই।" আত্ম-সর্বস্বপুরের নতুন নাম হল সমবায় সঞ্জীবন পুর!

এটা নেহাৎই গাল-গপ্পো! কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভূমি সংস্কারে নবতর প্রযুক্তির ইঙ্গিত:

(ক) এক লপ্তে চাষ—আলের সদব্যবহার।

(খ) সেচের বৈজ্ঞানিক উপায়।

(গ) কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা—কলের লাঙ্গল, মাটি পরীক্ষা, উন্নত বীজের ব্যবহার ও সারের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে ফসলের পাহাড়।

(ঘ) সমবায়িক পরিবহন ও বিপনন পদ্ধতি।

(ঙ) সমবায় ব্যাঙ্কের সৃজন।

এর আবার যে কোন একটাকে নিয়ে চলতে পারে নবতর প্রযুক্তির উপচক্র (Sub-cycle)। যেমন ধরুন সমবায় ব্যাঙ্ক। এর মাধ্যমেই রূপায়িত হতে পারে নানান প্রযুক্তি :

(১) ঋণ দান—কৃষিঋণ, সামাজিক ঋণ, শিক্ষা ঋণ।

(২) বিপদ-বারণ ভাণ্ডার (Provident Fund)।

(৩) গ্রামীণ উন্নয়ন ভাণ্ডার (Rural Development Fund)।

(৪) সমবায় দোকান ও খাদ্যবস্ত্রের আঞ্চলিক রেশন ব্যবস্থাতে লগ্নী।

(৫) গ্রাম সমীক্ষা, কর্মী প্রশিক্ষণ।

এই অনন্ত প্রযুক্তি মিছিলকে এই বইয়ের আয়তনে আঁটানো অসম্ভব। স্থানে স্থানে সমবায়ের উল্লেখ থাকলেও তার বিশদ ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে তাই গড়া হয়েছে এই আলোচনা কাঠামো। কাঠামোর নিম্নতম ৭টি ধাপ নিয়ে পরবর্তী সাতটি অধ্যায়ে দেখব কিভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্ভব। আপাততঃ এখানে সামগ্রিক ভাবে তাদের একটা মূল্যায়ণ করা যাক।

(১) আঞ্চলিক প্রকল্প—নাগরিক পরিকল্পনা (Town Planning) এর মত আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional Planning) এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের (যেমন ধরুন একটি নদীর অববাহিকা, কিম্বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা বা বেহড় অথবা চার দিকের সমতল থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মালভূমি) সব কটি গ্রামকে নিয়ে রাস্তাঘাট, বন্যা রোধক বাঁধ-জলা-সেচ ব্যবস্থা বা বিভিন্ন সেকটার ভাগ (আবাসিক ; কৃষি-ক্ষেত্র ; বন ; শিল্পাঞ্চল ; ক্যমুনিটি সেণ্টার—যার মধ্যে থাকবে স্কুল ; চিকিৎসালয়, হাট-বাজার, পঞ্চায়েত অফিস, খেলার মাঠ ইত্যাদি) নানা রকম আঞ্চলিক প্রকল্প গড়ে তুলতে পারলে তার সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারবেন ওই অঞ্চলের সমস্ত গ্রামবাসী। বিশেষতঃ বন্যা রোধক বা পথ ও জলপথের প্রকল্পগুলি এই রকম ব্যাপক ও সামগ্রিক না হলে সুফল পাওয়া যায় না। লেখক সোনারপুর থানায় এই ধরণের একটি নিকাশী প্রকল্পে প্রযুক্তিগতভাবে জড়িত

ছিল যাতে সামিল করতে হয়েছিল ৫টি অঞ্চলকে (ঋষি রাজ নারায়ণ অঞ্চল ১ ও ২, রামচন্দ্রপুর অঞ্চল, নরেন্দ্রপুর অঞ্চল ও রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির একাংশ)।

(২) গ্রামীণ আবাসন—গ্রাম সংগঠনের ক্ষুদ্রতম একক বা ইউনিট হল গ্রামবাসীদের কুঁড়ে ঘর। অর্থ নৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এগুলির দুরবস্থা সর্বজন বিদিত। সিমেন্টের ঢালাই বা পোড়া ইটের পাকা ইমারত পাইকারী হারে গ্রামে সম্ভব নয়। স্থানীয় সস্তা মালমশলা ও নির্মাণ কৌশলকে কিভাবে নতুন প্রযুক্তি দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্ত পোক্ত বাড়ীর উপযোগী করে তোলা যায় তা নিয়ে জাতীয় গৃহ সংস্থা (National Building Organisation), সি. বি. আর. আই. (Central Building Research Institute), আই. আই. টি (Indian Institute of Technology) সেকন (Cecon) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা, বহু গবেষণা করেছেন। আবিস্কৃত হয়েছে নতুন নতুন প্রযুক্তির নানান সূত্র। এই সঙ্গে আছে বহু একক প্রযুক্তিবিদ ও স্থপতির অবদান। এগুলি সর্বভারতীয় চরিত্রের গবেষণা এবং কিছুটা প্রক্ষিপ্ত। এদের মধ্যে থেকে যেগুলি পশ্চিমবঙ্গের মাটি, জল, হাওয়া ও নির্মাণ শৈলীর সঙ্গে খাপ খায় সেগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ের বিশদ আলোচনায়। এই সব প্রযুক্তির কম বেশী প্রয়োগে গ্রাম ব্যবস্থার কনিষ্ঠতম ইউনিটকে সুচারু ভাবে গড়ে তুলতে পারলে গ্রামের চেহারা পাল্টে যাবে দু-পাঁচ বছরেই। মনে রাখবেন, মৌচাকের বিস্ময়কর মনোহরণ গঠনশৈলী তার প্রত্যেকটি কুঠুরি বা সেলের আকৃতি ও প্রকৃতির উপরই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল।

(৩) শক্তির বিকল্প জ্বালানী—বিদ্যুতের যোগানে লোডশেডিং; ডলারের অভাবে পেট্রোলের ধারা শুষ্কপ্রায়; পথঘাট, রেললাইন, ট্রাক ও ওয়াগনের অপ্রতুলতায় গ্রাম দেশে কয়লা প্রায় অচেনা বস্তু, খনিজ গ্যাস তথৈবচ; আনবিক শক্তির ভবিষ্যৎ এদেশে বেশ খানিকটা অনিশ্চিত···এরকম অবস্থায় গ্রামীণ শিল্পকে যদি বলিষ্ঠরূপ দিতে হয়, পরিবর্ত জ্বালানীর সন্ধান আমাদের করতেই হবে। শিল্পকলার বলিষ্ঠ বিকাশ না হলে, শুধু কৃষিনির্ভর গ্রাম্য সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই শক্তির বিকল্প জ্বালানীর প্রয়োজন একান্ত। গ্রামাঞ্চলে যে সব শক্তির অফুরন্ত যোগান আছে তার মধ্যে প্রধানতম হল সৌর শক্তি। 'জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম মহাদ্যুতিম'··· এই দিবাকরমের কাছ থেকে আমরা আদায় করে নিতে পারি তাপ, বাষ্প,

বিদ্যুৎ। এর পর আছে জলশক্তি যা নদীর উপকূলে গ্রামের পর গ্রামে ঘুরিয়ে দিতে পারে টারবাইন। সমুদ্র উপকূলের বায়ুশক্তিও ফেলনা নয়। হল্যাণ্ডের মোট উৎপাদিত শক্তির ৩৩ ভাগ যোগায় বায়ু শক্তি উইণ্ডমিলের মারফৎ। আমাদেরও আছে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার বিস্তৃত উপকূল রেখা। বায়ু শক্তিকে (প্রতি বর্গমিটারে ২০০ কেজি) এই অঞ্চলে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৫৬-এর পশু গননার হিসাব মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গে গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর ও ঘোড়ার মিলিত সংখ্যা ১৭০ লক্ষ। গত ২৬ বছরে তার সংখ্যা দেড়া হয়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নি গৃহপালিত হাঁস মুরগী পাখীদের। এ ছাড়া আছে মানুষ···১০০ জনের মল থেকে দৈনিক ২·৮৩ ঘনমিটার জৈব গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে জৈব গ্যাসের সম্ভাবনাও নেহাৎ ফেলনা নয়···ঘুঁটে থেকে যার ১ শতাংশও উশুল হয় না। ক্ষেত খামারের জঞ্জাল থেকে ইথানল বা ইথিল অ্যালকোহল তৈরী করার এক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে অ্যামেরিকায় যা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রধান এলাকার উপযোগী করে গড়ে নেওয়া যায় অনায়াসে। ইথানলে চালানো যাবে ট্রাক্টর বা মাছধরা নৌকার ইঞ্জিন, জেনারেটার, সেচের পাম্প সেট। বাড়তিলাভ পেট্রল বা ডিজেলের মত পরিবেশ দূষিত করবে না।

(৪) **কুটির শিল্পে প্রযুক্তি**—কুটির শিল্প আঞ্চলিক হওয়া দরকার। শিল্প নির্বাচনের সময় দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এক, স্থানীয়ভাবে সহজে এবং সুলভে পাওয়া চাই মালমশলা এবং কারিগরী যা বংশানুক্রমিক হলেই ভাল হয়। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল শিল্পকে দুর্গাপুরের শালবনীতে চালু করতে গেলে মার অবশ্যম্ভাবী। দুই, শক্তির ন্যূনতম ব্যবহার ও কায়িক শ্রমের অধিকতম প্রয়োজন একান্ত বাঞ্ছনীয়। কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ঘটাতে আমরা উল্কার বেগে ছুটে চলেছি যান্ত্রিকতার পানে। ১৯৫১ সালে দেশে ছিল ৮৫০০ ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার (যান্ত্রিক হাত লাঙ্গল—১নং চিত্র) ছিল না একটিও। ঠিক তিরিশ বছর পরে আজ ট্রাক্টর চলছে ৫,০০,০০০; পাওয়ার টিলার ১,০০,০০০। ফল কৃষি উৎপাদন বাড়ছে নিঃসন্দেহে কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়ছে গ্রামীণ বেকারীও। একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার ১৫ জন কায়িক শ্রমিকের কাজ করে ফেলছেন। এছাড়া আছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। তার দরুণও শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে চলেছে শতকরা ২% শতাংশ হারে প্রতি

বছর। এই শ্রমিকদের জীবিকার সন্ধান দিতে আমাদের বেশী করে বাছাই করতে হবে সেই সব শিল্প যাতে জ্বালানী লাগে অল্প কিন্তু কায়িক শ্রমের দরকার বেশী। যেমন ধরুন চক শিল্প। জ্বালানীর খরচ শূন্য। মিশ্রণ, ছাঁচে ঢালা, প্যাকিং পুরোটাতেই দরকার শ্রমজীবি মানুষের সাহায্য। এই ধরণের শিল্পগুলিকে বেছে নিয়ে (যেমন পোড়ামাটির টালি প্রস্তুত—২ ও ৩নং চিত্র) তাতে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগিয়ে উৎপাদনের দক্ষতা বাড়াতে হবে। ২নং চিত্রে দেখুন হাত ছাঁচের বদলে টালি তৈরী হচ্ছে প্রেসে। তৈরী হচ্ছে বেশী টালি, মজবুত টালি। চক শিল্পের কথাতেই বলি। চকের মিশ্রণ সাধারণতঃ তৈরী হয় ৯৫ ভাগ প্লাষ্টার অফ প্যারিসের সঙ্গে ৫ ভাগ চীনে মাটি মিশিয়ে। প্লাষ্টার অফ প্যারিসের দাম অধুনা আকাশ ছোঁয়া। খাদি গ্রামীণ শিল্প কমিশন তাই গবেষণা করে বার করেছেন নতুন প্রযুক্তি যাতে শতকরা ৩০ ভাগ প্লাষ্টার অফ প্যারিসের বদলী হিসাবে ব্যবহার করা চলবে সস্তা কলিচুণ।

(৫) **কৃষি ও বনজ সম্পদ শিল্প**—প্রযুক্তির সর্বাধুনিক কৌশল হচ্ছে পুনর্বিনিয়োগ বা RECYCLING অর্থাৎ এমন সব শিল্পের সৃষ্টি করতে হবে যার কাঁচা মাল হবে কৃষি-উৎপাদন বা কৃষি জঞ্জাল এবং যার শিল্পউৎপাদন বা শিল্প জঞ্জাল কৃষিতে কাজে লাগবে সার বা কীটনাশক হিসাবে। সিট্রোনেলা তেলশিল্পে প্রয়োজন হয় সিট্রোনেলা ঘাসের চাষ। আবার এই শিল্পের জঞ্জাল থেকে তৈরী হয় সার। এইভাবে কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগে আখ, বীট, তুলা পাট ও আরো নানারকম তৈলবীজ। ধান চাষের ও ভানাইএর জঞ্জাল, নারকেল ছোবড়া, ঘাস, খাগড়া, পরিত্যক্ত খড় কুটো, কাঠ শিল্পের উদ্বৃত্ত ছাল এবং কাঠের গুঁড়ো ও চোকলা থেকে তৈরী হয় নানা রকম বোর্ড—নরম (Soft board) এবং শক্ত (Hard Board) কিম্বা কাগজ। ধানের হাস্ক বা খোসা থেকে সিমেণ্ট, কুঁড়ো থেকে তেল এবং সেই তেল থেকে সাবান। ইউরোপে যখন জোটে মাত্র ৩/৪ রকম তখন ভারতে জন্মায় অন্ততঃ ৪০ জাতের ভোজ্য ও অভোজ্য তৈলবীজ যা কাঁচামাল হিসাবে কাজে লাগতে পারে বনস্পতি, মেশিনের তেল, রংশিল্প ইত্যাদি নানান ক্ষেত্রে। তৈল বীজের খোল কাঁচামাল হিসাবে লাগবে সার শিল্পে। সার চলে যাবে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে। এরই নাম পুনর্বিনিয়োগ প্রথা। শেষ উদাহরণ আখ থেকে চিনি, চিনি থেকে প্লাষ্টিক (পি. ভি. সি.) অ্যালকোহল, অ্যালকোহল

থেকে গ্লুকোজ, গ্লুকোজ থেকে সার, সার থেকে আবার আখ। 'পুনর্মূষিক ভব', মাঝখান থেকে কিছু মানুষের রুজি রোজগার হল। আর বাড়তি পাওয়া গেল কিছু পি ভি.সি., স্টাইরিন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও পলিথাইলিন। এই সব উৎপাদনেই অ্যালকোহল হচ্ছে কাঁচা মাল।

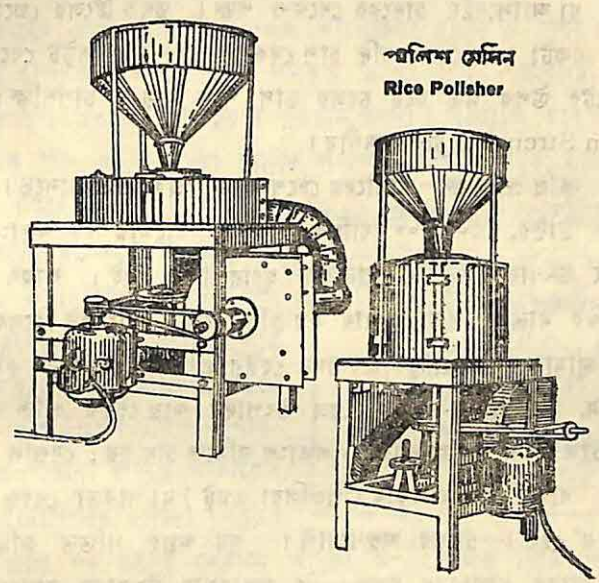

১নং নকশা—ভানাই যন্ত্র (Paddy Dehusker)

পুনর্বিনিয়োগ শুধু বড় বড় রাসায়নিক শিল্পেই নয়। ছোট কুটির শিল্পেও সম্ভব। তেলের ঘানি, তালগুড় ও খন্দসারী, ফল সংরক্ষণ, শস্য ভানাই ও পেষাই ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র শিল্পকেই খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন গ্রামীণ শ্রমিক প্রধান শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন যার কাঁচা মাল কৃষিজাত ও পণ্য বা জঞ্জাল কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। শস্য ভানাই বা চাল ছাটাই বলতে চালকল বোঝাই নি। নতুন প্রযুক্তি আপনাকে ৫০০০/৫৫০০ টাকার মধ্যে যন্ত্র যোগাবে যাতে শক্তির খরচ ১ বা ১½ অশ্বশক্তি মাত্র (১ নং নকশা)।

(৬) **জৈবশিল্পে প্রযুক্তি**—বিজ্ঞান আজ পশুপালন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অসাধ্য সাধন করছে। সঙ্কর জাতের গাভী রোজ এক মণ দুধ দিচ্ছে; মুরগী বছরে ডিম দিচ্ছে ৩০০ এর উপর; রাশিয়ায় চেষ্টা চলছে মুরগীকে দিয়ে রোজ

২টো ডিম পাড়ানো—সকালে এবং বিকালে। মৌমাছি পালন, মাছ চাষ, শুয়োর পোষা থেকে শুরু করে দুগ্ধজাত খাদ্য ও ওষুধ, দুগ্ধ সংরক্ষণ মায় চর্ম-শিল্প পর্যন্ত সর্বত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর খেলা। মানুষের চুলের সঙ্গে সিমেণ্ট মিশিয়ে প্রেসে চাপ দিয়ে ঢেউ খেলানো একরকম সস্তা ফাইবার বোর্ড করা যায় যা অ্যাসবেষ্টস চাদরের থেকেও শক্ত। দুখণ্ড ষ্টিলের প্লেটের মাঝে মানুষের একটা চুল রেখে যদি চাপ দেওয়া যায়—চুল অটুট থেকে যায়। ষ্টিল প্লেটের উপর গর্ত হয়ে চুলের ছাপ পড়ে যায়। চাপশক্তি (Compression Strength) চুলের অসীম।

(৭) কৃষি প্রযুক্তি—আমাদের দেশে সবুজ বিপ্লব হয়ত এসেছে। চলছে ৫০০,০০০ ট্রাক্টর, ১০০,০০০ যান্ত্রিক লাঙ্গল। রাজ্যের ৫০ শতাংশ মানুষ ব্যস্ত কৃষি উৎপাদনে। তবু আনন্দিত হবার কিছু নেই। কারণ রাজ্যের মোট রুজির মাত্র ৩০ শতাংশ আয় হয় কৃষি থেকে। ধানেরই হিসেব নেওয়া যাক। আমাদের গড় বার্ষিক উৎপাদন হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২৫ কুইনটাল। তাইওয়ান, ফিলিপাইন ও ইজরায়েল উৎপাদন করে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৭৫ কুইন্টাল। পশ্চিম বাংলার ৬০ শতাংশ জমিতে চাষ হয়; যেগুলি উর্বর ও সমতল। বাকী জমি মালভূমি (পুরুলিয়া প্লেটু) বা পার্বত্য বেহড় (সাব-হিমালয়ান রেঞ্জ)—চাষের অনুপযোগী। খুব অল্পই পতিত জমি আছে যেখানে চাষের সম্প্রসারণ সম্ভব। এ মতাবস্থায় উৎপাদন বাড়াতে হলে টেকনলজীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া নান্য পন্থাঃ।

এই প্রসঙ্গে আই. এল. ও. (International Labour Organisation)-এর কেথ মার্সডেন এক ৫ দফা কার্যক্রম বাৎলেছেন ঃ

(১) স্থানীয় কৃষিপ্রযুক্তি যা বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে তাকে ভিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। (২) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর উপযোগী উন্নত কৃষিযন্ত্রের উদ্ভাবন করতে হবে। (৩) কৃষিকার্য যাতে পূর্ণোদ্যমে হয় সেজন্য পরিবার প্রতি কৃষিক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে হবে (৪) সৃষ্টি করতে হবে কৃষি সমবায়—সেচ, কৃষি-ঋণ, ট্রাক্টর, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য যন্ত্র সরবরাহ, পণ্যের রক্ষণ ও বিক্রয় ব্যাপারে (৫) যথাসম্ভব জমিকে দু-ফসলা করে তুলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১৬ শতাংশ চাষের জমিতে বছরে দুবার ফসল হয়। এ বাবদে নদীয়া সর্বোচ্চে (৫২%) এবং বর্ধমান (৭%), বাঁকুড়া (৬%) ও

মেদিনীপুর (৬%) সর্ব নিম্নে। এ হিসাব অবশ্য ১০ বছরের পুরানো এবং ইতিমধ্যে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। আজও তবু জমিকে দু-ফসলা করাই পশ্চিমবঙ্গের কৃষি উৎপাদন বাড়াবার একমাত্র উপায়। জমিকে দু-ফসলা করতে দরকার উপযুক্ত সেচ, উন্নত বীজ ও প্রচুর সার প্রয়োগ। বীজের উন্নয়ন, গবেষণাগারের প্রযুক্তি; এই বই-এর আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। সেচ ব্যবস্থাকে বাড়াতে হলে সেচখাল, নলকূপ ও পাতকুয়া (পুরুলিয়া প্লেটুতে খাল বা নলকূপ অসম্ভব, পাতকুয়াই একমাত্র ভরসা) বাড়াতে হবে ও সেচের জন্য উইণ্ড মিল এবং হাওয়া চালিত পাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে (গঙ্গাম কলেজের চত্বরে বসান ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন প্রথম হাওয়া পাম্পটি তৈরী করেছেন এলাহাবাদ পলিটেকনিক, দাম দশ হাজার টাকার মত)। সার প্রয়োগের ব্যাপারেও আমরা পেছিয়ে আছি। নাইট্রোজেন সার ও সুপার-ফসফেটের অভাব রয়েছে বাজারে। ফলে নাইট্রোজেনের চাহিদা যেখানে হেক্টার প্রতি ৩৫ কেজি সেখানে আমরা ১০ কেজিও দিতে পারি না। অভাবটুকু আংশিকভাবে মিটতে পারে যদি আমরা ব্যাপক হারে জৈব গ্যাস যন্ত্র বসিয়ে তার তরল সার ও পচা কচুরী পানা ক্ষেতে ব্যবহার করি। এছাড়া পতিত জমিতে বারসিম, লুসার্ন ও নীচু জমি হলে নেপিয়ার ঘাস, এলিফ্যান্ট ঘাস ইত্যাদি চাষ করা যায়। জমিকে উর্বর করা ছাড়াও পশুখাদ্য হিসাবে এগুলি চমৎকার। সবশেষ, উৎপাদনে দুনিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে কৃষিকে পুরোপুরি যান্ত্রিক করে তোলা ছাড়া উপায় যে নেই ২নং নকশার গ্রাফ দেখলেই তা মালুম হবে। ৩নং নকশায় দেখুন ওই বাড়তি শস্য গাড়ীতে বোঝাই করার যন্ত্র। ডিজাইন অষ্ট্রেলিয়ার।

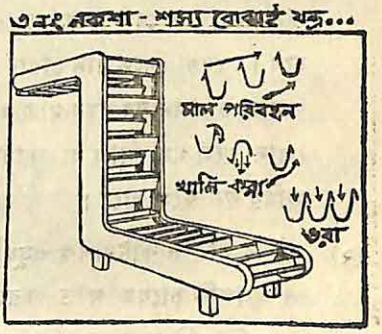

উপরে যে সব প্রযুক্তি প্রসারণের (Technology Transfer) কথা বলা হল তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও তার ফলে যে গ্রামবিপ্লব হতে পারে তা নিয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করব। আপাততঃ একটা ছোট্ট অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করেই শেষ হবে এই প্রস্তাবনার অধ্যায়।

পরিবেশ দূষণ—হ্যাঁ, গ্রামের মুক্ত প্রান্তরেও এই ভয় রয়েছে। অন্ততঃ শ্রীসমরজিত কর তাই বলেছেন :

(১) অধিক ফলনে অধিক জল দরকার। গভীর নলকূপ দিয়ে সে জলের যোগান দিতে গিয়ে নানান খনিজ পদার্থকে জলের সঙ্গে তুলে এনে আমরা মাটিকে অনুর্বর করে তুলছি। গভীর নলকূপের জল সরাসরি সেচে না দিয়ে সেটলিং (থিতাবার) ট্যাঙ্কের মারফৎ দিলে অনেক খনিজ পদার্থ ক্ষেতে পৌছানোর আগেই ট্যাঙ্কে থিতিয়ে যাবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত জল দেবেন না। তাতে মাঠে খনিজ পদার্থ মিশবে কম, অল্প জলে বেশী এলাকায় সেচ হবে এবং বিশ্বাস করুন, ভাল ফলন হবে। দেখা গেছে ধান চারার ফলন সবচেয়ে ভাল হয় যদি তা বীজ তলায় ও প্রজননের সময় মাত্র ৫ সেন্টিমিটার জলের তলায় থাকে। জল লোনা হলে গম, বার্লি বা তামাকের চাষ করুন। ভাল ফলন হবে। জমির নুন কমে যাবে।

(২) অজৈব সার ও কীটনাশক ওষুধ খাল বিলের জলকে বিষাক্ত করে মাছ ও অ্যালজি চাষের ক্ষতি করছে। মাছ চাষের পুকুরের চারপাশে উঁচু পাড় দিয়ে দিলে এ দূষণ বন্ধ হতে পারে।

(৩) চাষের জমি বাড়াবার নেশায় জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে। তাতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে খরা বাড়ছে। প্রযুক্তিগত জবাব—জমি বাড়াবার অপচেষ্টাকে সীমিত করে, বেশী জমিকে দু-ফসলা করবার চেষ্টা করলে উৎপাদনও বাড়বে, পরিবেশও নির্মল থাকবে।

(৪) কীটনাশকের বদলে ক্ষতিকর কীটকে ধ্বংস করে উপকারী কীট আজোব্যাক্টেরিয়া পালনের গবেষণা চলছে। সে প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করুন।

পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ প্রযুক্তি প্রসারণ এক বিপুল কর্মকাণ্ড। তার বিবরণ দেওয়া তো বিপুল সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ কৌমুদী রচনার স্তরে পৌছানো। অধিকন্তু প্রযুক্তি বাবদ লেখক এক নগণ্য মোল্লা যার দৌড় বর্ণপরিচয় অবধি। এই ক্ষুদ্র বইটি তাই গ্রামীণ প্রযুক্তির বর্ণপরিচয় মাত্র। তবে আশা রাখি সত্যিকার গুণীজন একে ভিত্তি করে একদিন আসল ব্যাকরণ-কৌমুদী রচনা করবেন। বাংলাতেই।

২

আঞ্চলিক প্রকল্প

কয়েকটা টুকরো খবর :

- '৭৮-এর বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে ভেসে গেছে ১,০০০,০০,০০,০০০ টাকার গ্রামীণ সম্পদ।
- ২০০০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বিশ্বের গ্রামীণ জনসংখ্যা দাঁড়াবে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির মোট জনসংখ্যার কুড়ি গুণ।
- রাজস্থান সরকার আদিবাসীদের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির খাতে ৮১-৮২ সালে বিনিয়োগ করেছেন ২০৩ কোটি টাকা।
- অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ কচুরী-পানাকে লাগিয়েছেন জল শোধনের কাজে।
- বালী থানার নিশ্চিন্দা গ্রামের নবারুণ সাহিত্যগোষ্ঠীর তরুণরা ওই অঞ্চলে গোবর গ্যাস প্রকল্প, বৈজ্ঞানিক মাছ চাষ ও বাঁশের নলকূপ বসানোর কাজে হাত দিয়েছেন।

নেহাৎই ছোট ছোট সংবাদ, খবরের কাগজের এখান ওখান থেকে নেওয়া। তবু এর মধ্যে থেকেই পরিষ্কার ফুটে উঠছে দেশব্যাপী প্রযুক্তি-প্রসারণ (Technology Transfer)-এর বিপুল তাগিদ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলও সে তাগিদের হিস্যাদার পুরোমাত্রায়।

দেশের আশী শতাংশ মানুষ গ্রামে থাকেন। গ্রামবাংলার উন্নতি না হলে সামগ্রিক উন্নতি দূরপরাহত। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় '৭৮-এর নির্বাচনে পঞ্চায়েতের হাতে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়নের। নানান জনসেবী প্রতিষ্ঠানও হাত লাগিয়েছে গ্রামে গ্রামে রাস্তা তৈরী, পুকুর পরিষ্কার, ইস্কুল বানানো, বয়স্ক শিক্ষা, বিদ্যুতিকরণ, মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো, বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষের উপায় বাৎলানো ইত্যাদি নানান কাজে। এখনই দরকার প্রযুক্তি প্রসারণের। গ্রাম্য মালমশলা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রকরণ —সব কিছু বিচার করে উদ্ভব করতে হবে গ্রামীণ প্রযুক্তি যার প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে আঞ্চলিক পরিকল্পনা। আঞ্চলিক পরিকল্পনা এক বা একাধিক গ্রামকে (যা একই ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত) পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গড়ে

তোলার আঙ্গিক যার মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মসূচী (গ্রামীণ জলসরবরাহ, স্যানিটারী পায়খানা ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ, মশক বিনাশ), শিক্ষাকর্মসূচী (প্রাইমারী স্কুল, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয়, হাতের কাজ শেখানোর কেন্দ্র স্থাপন) ও উন্নয়ন কর্মসূচী (রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, গ্রাম বিদ্যুতিকরণ বা পরিবর্ত জালানীর ব্যবস্থা, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের ভূদান, বৃষ্টি-বন্যা-শীত-খরা-আগুন-ভূমিকম্পের বিরুদ্ধে গ্রাম ও গৃহ রক্ষার আঞ্চলিক কৌশল উদ্ভাবন) অন্তর্ভুক্ত। এ এক বিরাট পুনর্গঠন কর্মযজ্ঞ : নবরূপে এক সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে তোলার। আঞ্চলিক প্রকল্প রচনা ও রূপায়ণের প্রথম ধাপ হবে গ্রামে গ্রামে সার্ভে বা অনুসন্ধান চালিয়ে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, প্রকল্প রূপায়ণের সময় নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বানানো ও পল্লীবাসীকে প্রযুক্তি বাবদ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া। এবং শেষ ধাপ হচ্ছে প্রকল্পের মূল্যায়ন ও পরবর্তী প্রকল্পের জন্য তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'প্রতিটি আত্মা হচ্ছে অজ্ঞানতার মেঘে-ঢাকা সূর্য' (Every soul is a Sun coverd with clouds of ignorance)। প্রকল্পকের প্রধান কাজ কোথায় সেই মেঘ, কেমন করে তা সরানো যায় তার অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানান্তে তা সরাবার ব্যবস্থা করে সেই সূর্যালোকের সুপ্রকাশ ঘটানো অর্থাৎ সমীক্ষা, সময়ভিত্তিক প্রকল্প রচনা এবং এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দান। এই অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা মূলতঃ পাঁচ দফা :

(১) খামার—সেচ ব্যবস্থা, ক্ষেতের মাপ (Plot size), শস্য পরিচয়, মালিকানা, পালিত পশু-পাখীর বিবরণ ও সংখ্যা, ধন-বিনিয়োগ।

(২) জীবিকা—বিবরণ ও শ্রেণীবিভাগ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপাদনের ক্রয়-বিক্রয় ((Marketing), দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা, ধন বিনিয়োগ।

(৩) বসতি—বাস্তুর বিবরণ ও শ্রেণী বিভক্ত সংখ্যা, সামাজিক সুখ-সুবিধা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল, ধর্মস্থান, হাট-বাজার, খেলার মাঠ, যুব-সংগঠন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, সমবায়, সামাজিক বিবরণ।

(৪) জীবন—খাওয়া পরা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান ও চাহিদা।

(৫) মানুষ—বয়সানুক্রমিক স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা, জীবিকা, ভাষা শিক্ষা ও আয়ভিত্তিক সংখ্যা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী, ধর্মীয় পরিসংখ্যান।

প্রয়োজন মাফিক ফর্ম (form) তৈরী করে সার্ভে মারফৎ এই সব পরিসংখ্যন (Data) লিপিবদ্ধ করলেই গ্রামীণ বা আঞ্চলিক প্রয়োজন ও চাহিদা ফুটে উঠবে। এরপর প্রকল্পককে চিন্তা করতে হবে স্থলভতম উপায়ে কি ভাবে এসব প্রয়োজন মিটানো যায়। উপায় উদ্ভাবিত হলে রচনা করতে হবে তার রূপায়নের সময়ভিত্তিক প্রোগ্রাম এবং পল্লীবাসীকে এ বাবদ সচেতন করে তুলতে হবে প্রশিক্ষণ মারফৎ। এরই নাম প্রযুক্তি প্রসারণ। এ প্রশিক্ষণ হতে পারে তিন উপায়ে :

***গণ সংযোগ (Mass Approach) :**

প্রচার পুস্তিকা, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন, ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী, গণসভা বা বেতার প্রচার মারফৎ।

***দল সংযোগ (Group Approach) :**

যুব সংগঠন, সেমিনার, ভারতদর্শন, সিমপোসিয়াম, ছায়াচিত্র ও নাটক প্রদর্শনী, পোষ্টার মারফৎ।

***ব্যক্তি সংযোগ (Individual Approach) :**

দরজা থেকে দরজায় প্রচার, পত্রলাপ, হ্যাণ্ডবিল মারফৎ।

যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পে এই প্রশিক্ষণ খুবই দরকারী। প্রকল্পের সার্থকতা আসবে না যদি স্থানীয় মানুষ সহোৎসাহে তাতে অংশ না নেয়। আমাদের বেশীর ভাগ গ্রামীণ প্রকল্পই শহুরে মানুষ রচনা করেন গবেষণাগারের চার দেয়ালের আড়ালে। তার প্রযুক্তি পৌছায় না গেঁয়ো চাষা-ভুষো, কুমোর-কামারের মস্তিষ্কে। মূর্তি তৈরী হয় অপরূপ, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। সবটাই পুতুল খেলার সামিল হয়ে যায়। শহুরে 'ইঞ্জিরি' বাবুদের তামাশা দেখতে ভীত সন্ত্রস্ত পল্লীবাসী জমায়েত হয় ঠিকই। কিন্তু বিস্মিত দর্শকের ভূমিকায়। তামাশা ভাঙ্গলে ফিরে যায় যে যার কাজে। উন্নয়ন প্রকল্প তাদের নিজেদের কাজ হয়ে ওঠে না। ব্যর্থ হয় প্রকল্পের উদ্দেশ্য। সার্বিক উন্নয়নকে সার্থক

করতে হলে কাজ করতে হবে গ্রামবাসীর সঙ্গে, গ্রামবাসীর জন্য নয় (work with the people, not for the people)।

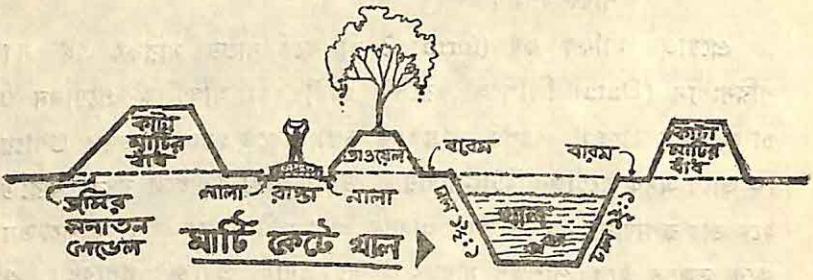

৪নং নকশা

আঞ্চলিক প্রকল্পকে প্রযুক্তিগত ভাবে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায় (অবশ্য এগুলির প্রত্যেকটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং একে অন্যের পরিপূরক) :

ক : জল সরবরাহ—সেচ ও পানীয়

বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলি গ্রামীণ প্রযুক্তির বাইরে। তার জন্য আছেন সরকারী সেচ বিভাগ। পুষ্করিণী খনন, ছোট জাতের নলকূপ, ডোঙ্গা বা লাটা দিয়ে জল তুলে (এ বাবদ উইণ্ড মিল-ও ব্যবহার করা চলে—পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) সেচের কাজে ব্যবহার করা বা সেচ বিভাগের ক্যানেলের আউট-লেট পয়েন্ট থেকে ছোট-খাট খাল কেটে জল চাষের জমিতে নিয়ে যাওয়া—এই সবই গ্রামীণ সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ১৯৬০ সালের জাতীয় কৃষিমেলায় শ্রীবিনয়েন্দ্র রায় বলদ চালিত মোটর ও পাম্পে জল তুলে দেখিয়েছিলেন। আমি উদ্ভাবক নই। তবে যে কোন আবিষ্কারক সাইকেলের চাকার সঙ্গে কপিকলের দড়ি জুড়ে পায়ে চালান প্যাডেল ঘুরিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন জল তোলা পাম্প। আফ্রিকার বটসোয়ানায় পলিথিন সিটের তৈরী ১০,০০০ গ্যালন ট্যাঙ্কে সম্বৎসর জমা রাখা হচ্ছে সেচের জল। এ সব প্রযুক্তিও মূলতঃ গ্রামীণ।

সেচ বিভাগ প্রধান (Main) ক্যানেল, তার শাখা (branch) ও ছোট (Minor) ক্যানেল মারফৎ জল আউট লেট পয়েন্টে পৌছে দেয়। এখান থেকে কৃষিক্ষেত্রে জল নিয়ে যাবার দায়িত্ব কৃষক সমবায় বা পঞ্চায়েতের। এ দায়িত্ব পালন করতে ছোট-খাট যে সব খালের সাহায্য

নেওয়া যেতে পারে তাকে গ্রামীণ প্রযুক্তির ভিতর ফেলা যায়। এই খাল তিন রকমের হতে পারে—(১) মাটি কেটে তৈরী খাল (৪নং নকশা), (২) মাটি ভরে তৈরী খাল (৫নং নকশা) এবং (৩) আংশিক কাটা ও আংশিক ভরা খাল। খাল কাটবার আগে যে সব জমি দিয়ে খাল কাটা হবে তার কণ্টুর (Contour) বা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ওইস্থানের আপেক্ষিক উচ্চতা সম্বন্ধে ভাল রকম ধারণা করে নিতে হবে। এ ধারণা করা তখনই সম্ভব যদি ওই স্থানের লেভেলিং বা কণ্টুর জরিপ করিয়ে টপোগ্রাফিক্যাল নকশা (যাতে সমোচ্চ স্থানগুলি যে কাল্পনিক রেখায় যুক্ত তা দেখানো থাকে) বানিয়ে নেওয়া যায়।

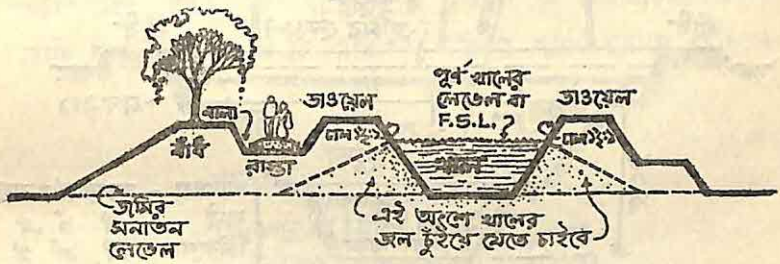

৫নং নকশা-মাটি ভরে খাল।

সেচ খাল ও ময়লা জলের নিষ্কাশনী খাল সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণতঃ সেচ খাল কাটা হয় অধিত্যকার উপর দিয়ে এবং নিষ্কাশনী খাল যায় উপত্যকার নীচে দিয়ে। প্রতিটি আউট লেট পয়েন্ট থেকে ৪০-৫০ হেক্টর জমির জল সেচ হতে পারে। এই জমির মালিকানা প্রায়শঃই বহু সংখ্যক কৃষকের। পঞ্চায়েত বা কৃষক সমবায় জল বণ্টনের দায়িত্ব না নিলে সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব নয়। বিভাগীয় দায়িত্ব আউট লেট পয়েন্টেই শেষ হয়ে যায়। এখানে পঞ্চায়েতী দায়িত্ব সুরু না করলে (প্রায়শই করা হয় না) তীরে এসে তরী ডোবার মত সেচ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

খালের পরেই আসে পুকুর (৬নং নকশা)। পুকুর কাটার মধ্যেও অল্পসল্প প্রযুক্তি আছে। যেমন ঃ

(১) পুকুরের ঢাল ৩:১ এর থেকে বেশী খাড়া হয়ে গেলে বর্ষায় পাড় ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

(২) প্রতি এক দেড় মিটার গভীরতায় নকশা মাফিক ধাপ ছেড়ে যেতে হয়।

(৩) পুকুরের পাড়ে গাছ পুঁতলে তার শিকড় পাড়ের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তবে বড় ঘন গাছ (অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল) পুকুরের জলে রোদ পড়া আটকে দিতে পারে। এটি মাছ চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই পাড়ের গাছ ছোট ও হালকা (নারকেল, খেজুর, সুপারী) হওয়া দরকার।

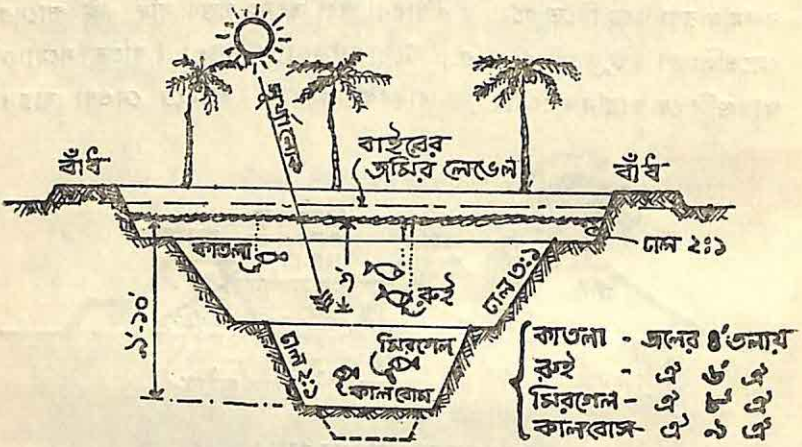

৬নং নকশা-প্রযুক্তি সম্মত মাছচাষের পুকুর।

(৪) চার পাশের পাড়ে জমি থেকে এক-দেড় হাত উচু বাঁধ দিয়ে দেয়া দরকার যাতে আশে-পাশের ময়লা জল পুকুরে ঢুকতে না পারে। এ ধরণের ময়লা জল পানের এবং মৎস্য চাষের পক্ষে মারাত্মক।

(৫) পুকুরের জলের গভীরতা ৯/১০ ফুট (৩ মিটার) হওয়া দরকার। তলদেশে পাঁক কম হলেই ভাল। ১০ ফুট গভীর না হলে সারা বছর জল থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের দশলাখ পুকুরের অর্ধেক গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়; মাছচাষ বা জল সঞ্চয়ের কাজে লাগে না।

পুকুরের পরই পাতকুয়া এবং নলকূপ। পুরুলিয়া প্লেটু অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের মালভূমি এবং বর্ধমানের কোলিয়ারী অঞ্চলে পাথুরে মাটির দরুণ ক্যানেল বা নলকূপ সম্ভব নয়—পাতকুয়াই একমাত্র ভরসা। পাতকুয়া দুই জাতের—কাঁচা ও পাকা। কাঁচা কুয়া ৪ থেকে ৬ মিটার গভীর ও ১/২ মিটার চওড়া হয়। কুয়ার পাড় যাতে ধ্বসে না পড়ে সে জন্য গর্তটি পোড়া মাটি বা কংক্রিটের চাক দিয়ে লাইনিং দেওয়া হয়।

রাণীগঞ্জ-রাজমহলের পাশে যেখানে চিনামাটি পাওয়া যায়, সেখানে চাকের মাটিতে অল্প চিনামাটি মিশিয়ে নিলে কাঁচা কুয়ার লাইনিং পাকা কুয়ার চেয়েও মজবুত হয়ে উঠতে পারে। অনেক সুলভে। পাতকুয়ার প্রয়োজন ওই অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। স্থানীয় প্রকল্পকরা এই প্রযুক্তিটুকুকে কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন। পাকা কুয়া হয় গভীরতর, ব্যাসেও বড় এবং স্বভাবতই ব্যয়সাধ্য। কার্টার যুক্ত ঢালাই ওয়েল কার্ব (গ্রামে পাওয়া তুষ্কর) বসিয়ে একই সঙ্গে মাটি কাটা ও পাড়ের গাঁথনী) ৪ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেন্টের মশলা দিয়ে গাঁথতে হবে পোড়া ইটে) চলবে যতক্ষণ না ঈপ্সিত গভীরতায় পৌছানো যায়। কার্ব সমান ভাবে মাটিতে নামা দরকার। এঁকে বেঁকে গেলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাঝে মাঝে পাথুরে মাটি পেলে ডিনামাইট ব্যবহার করতে হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত পাকা কুয়াকে যথাসম্ভব

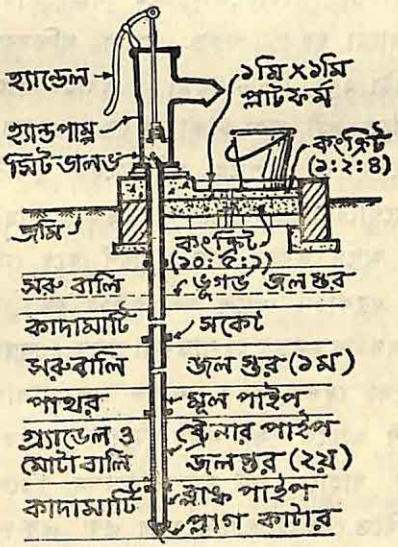

৭নং নকশা-টিউবওয়েল।

গ্রামীণ প্রযুক্তির মধ্যে না আনাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কুয়া থেকে জল তোলার জন্য বলদ ব্যবহারের প্রযুক্তির কথা আগেই বলেছি। শক্তির বিকল্প উৎস হিসাবে পশুকে কাজে লাগান অতি প্রাচীন প্রথা। পশ্চিমবঙ্গে চাষের ক'মাস বাদ দিলে বাকি সময় বেকার বলদ দিয়ে জল পাম্প করে উঁচুতে রাখা

S.C.E.R.T., West Bengal,
Date 8-5-87
S.C.E.R.T., West Bengal
Library

পলিথিনের জলাধারে জল সঞ্চয় করা যায় যাতে খরার সময় সেচের অভাব না হয়।

সব শেষ নলকূপ (৭নং নকশা)। আমার মতে গ্রামীণ প্রযুক্তিতে এর সম্ভাবনা অনেক। যেহেতু ভূপৃষ্ঠের জলকে (যাকে নকশায় দেখানো হয়েছে ভূগর্ভ-জলস্তর বলে) বাদ দিয়ে নীচের ভূতল জলস্তর (১ম বা ২য়) থেকে জল আহরণ করা হয়, আপেক্ষিক ভাবে নির্মলতর পানীয় জল পাওয়া যায় যাতে শোধন প্রক্রিয়ার খরচ এড়ানো যেতে পারে। শহরাঞ্চলে ঘেঁষাঘেঁষি করে নলকূপ বসাতে হয় বলে ভূতল জলস্তর নেমে যায় ও জলের অনটন দেখা দেয়। গ্রামের খোলা-মেলায় এই প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভাবনা কম। আজকাল সস্তায় প্লাষ্টিক এবং সস্তাতরয় বাঁশের নলকূপের চলন হচ্ছে। এগুলি গ্রামীণ প্রকল্পের উপযুক্ত।

ভূতল জলস্তর শুধু শহরাঞ্চলেই কমে না, গ্রামাঞ্চলেও কমে যদি গভীর নলকূপ বসানো হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গায় নলকূপের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট সমস্যা। যেখানে জলস্তর কমছে সেখানে নলকূপের জন্য প্রচুর লগ্নী করা টাকা নষ্ট হয়। এ সব ক্ষেত্রে কিন্তু বাঁশের নলকূপও ব্যর্থ হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভালাপমেণ্ট করপোরেসান প্রচুর কাজ করেছেন। গ্রাম সংগঠকদের উচিত নলকূপ বসানোর আগে এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া। সেচ খালে সমবায়িক ব্যবস্থা দরকার। খালে জল অপচয় হয়। নলকূপে এ সবই এড়ানো যায়। অগভীর নলকূপ বা পাতকুয়া থেকে ৫ অশ্বশক্তির পাম্পে কাঁচা নালার মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়। অর্ধেক জল নালায় চুঁইয়ে নষ্ট হয়। ৫/৬ একরের বেশী জমিতে সেচ সম্ভব হয় না। হালকা অ্যালুমিনিয়াম বা পলিথিন পাইপের সাহায্যে ওই জল পরিবেশন করলে ওই এক খরচে ১১ একর পর্যন্ত জমিতে সেচ দিতে পারা যাবে এবং এক-দু বছরেই পাইপের দাম উঠে আসবে। নালা ও তার পাড়ের দরুণ যে জমি ছাড়তে হত তাতেও ফসল ফলবে। উঁচু জমিতেও সেচ সম্ভব হবে। নলকূপ ও হালকা পাইপের সমন্বয়ে আধুনিক সেচ প্রথার প্রযুক্তি যত প্রসারিত হয়, ততই মঙ্গল (সাক্ষী—রায়গঞ্জ, বোলপুর টেগোর সোসাইটি, হুগলী, ২৪ পরগণা ও জলপাইগুড়ির কৃষক সমবায় সমূহ যাঁরা এই পদ্ধতিতে সেচ দিচ্ছেন)।

নলকূপের প্রযুক্তিগত বিশেষত্ব হচ্ছে তার গভীরতা ও ফিল্টারের সংখ্যায়।

এর জন্য প্রয়োজন কোন সর্বগ্রাহ্য ফরমূলা নয়, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য আধিকারিক অবশ্য এ বাবদে সমীক্ষা করে এক তালিকা বানিয়েছেন প্রকল্পকদের সাধারণ জ্ঞানের জন্য। তার সংক্ষিপ্তসার এখানে দিলাম (পেয়েছি শ্রীনারায়ণ স্যান্নালের গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা বইতে।):

২৪ পরগণা

৯০ মিটার—বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবড়া, দেগঙ্গা, রাজারহাট, বারাসত, আমডাঙ্গা, বসিরহাট, গোসাবা, বেহালা, যাদবপুর, ব্যারাকপুর (শেষ ৩টিতে জেট টাইপ টিউবওয়েল লাগে)

২৪০ মিটার—মহেশতলা, কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাড়োয়া, মিনাখান, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, সোনারপুর, বিষ্ণুপুর, বজবজ, বারুইপুর, ক্যানিং, বাসন্তী, জয়নগর, কুলটাকী, মগরাহাট, ফলতা, ডায়মণ্ডহারবার, কুলপি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা (শেষ ১৫টিতে জেট টাইপ দরকার। সরকারী তালিকার সঙ্গে লেখকের অভিজ্ঞতা মেলে না। সোনারপুর থানার দঃ লস্করপুর গ্রামে ২৪০ মি. নলকূপটি ২ বছরেই অকেজো হয়ে যায়, ৫০ মি. গভীর নলকূপটি চমৎকার জল দিয়ে চলেছে গত দশ বছর। কোন ক্ষেত্রেই জেট টাইপ লাগে নি।)

নদীয়া

৪৫ মিটার—করিমপুর, তেহট্ট, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, হাঁসখালি, রাণাঘাট, চাকদা, হরিণঘাটা (প্রক্ষিপ্তভাবে লাগে জেট টাইপ।)

মুর্শিদাবাদ

৪৫ মিটার—ফারাক্কা, শামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, ভগবানগোলা, রাণীনগর, সদর, জিয়াগঞ্জ, ভরতপুর, বেলডাঙ্গা, সাগরদীঘি, লালগোলা, নবগ্রাম, খারগ্রাম, বারওয়ান, কাঁদি, বহরমপুর, হরিহরপুর, নয়্যাদা, ডোমকল, জলাঙ্গী (শেষ ১১টিতে জেট টাইপ প্রয়োজন।)

মালদা

৬০ মিটার—হরিশচন্দ্রপুর, খয়রা, রতুয়া ইংলিশবাজার, মাণিকচক, কালিয়াচক।

৯০ মিটার—গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, সদর (জেট টাইপ লাগে।)

পঃ দিনাজপুর

৬০ মিটার—চোবড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর, চাকালিয়া, কারানডি, রায়গঞ্জ, হেতমাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, কুশমুণ্ডি, ইটাহার, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, বংশীহারী, তপন, বালুরঘাট, হিলি (প্রক্ষিপ্তভাবে জেট টাইপ লাগে, বিশেষতঃ তপনে, ১০০ মিটার গভীরতাও প্রয়োজন হতে পারে।)

জলপাইগুড়ি

৪৫ মিটার—সারা জেলায়। ইঁদারার চলই বেশী। মাদারীহাট, কুমারগঞ্জ, মাল, মিটিয়ালী, নাগরাকোটাতে সবই ইঁদারা।

কুচবিহার

৪৫ মিটার—সারা জেলায়।

হাওড়া

৭৫ মিটার—বালি, জগাছা, ডোমজুড় (আংশিক)।

১৫০ মিটার—পাঁচলা, আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া, শ্যামপুর, ডোমজুড় (আংশিক), উদয়নারায়ণপুর ও জগৎবল্লভপুর (শেষ দুটিতে স্থানে স্থানে জেট টাইপ লাগে।)

হুগলী

৭৫ মিটার - গোঘাট, আরামবাগ, খানাকুল, ধনেখালি, বলাগড়, মগরা চুঁচুড়া, পোলবা, দাউদপুর, তারকেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডিতলা, জাঙ্গিপাড়া, ফুরসুরা ও পাণ্ডুয়া (শেষ দুটিতে জেট টাইপ প্রয়োজন।)

মেদিনীপুর

(ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে নলকূপ হয় না।)

৬০ মিটার—মোহনপুর, দাঁতন।

১২০ মিটার—নারায়ণগড়, সবং, পাংলা, দেবড়া, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, দাসপুর, পটাশপুর, এগরা।

১৫০ মিটার—পাঁশকুড়া।

১৮০ মিটার—ময়না, তমলুক, মহিষাদল, রায়নগর, দীঘা, কণ্টাই, খেজুরী, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, সদর, শালবনি, গড়বেতা (শেষ ৫টিতে জেট টাইপ লাগবে)।

২৪০ মিটার—সাঁথরাইল, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর, সুতাহাটা (শেষটিতে জেট টাইপ দরকার)।

পুরুলিয়া

নলকূপের চলন নেই। সবই পাতকুয়া।

বাঁকুড়া

নলকূপের চলন বিশেষ নেই। প্রায় সবই পাতকুয়া। কিছু ৪৫ মিটার গভীর জেট টাইপ নলকূপ আছে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পত্রসির, জয়পুর, ইন্দাস ও কোতুলপুরে।

বর্ধমান (ইঁদারা অঞ্চল জামুরিয়া, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল)

৯০ মিটার—জেলার বাকি অঞ্চল। জেট টাইপ ফরিদপুর, আউসগ্রাম, সদর, ভাতার, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পূর্বস্থলী ও কালনা (চিত্তরঞ্জন, কুলটি, আসানসোল, বরাকর, হীরাপুর, দুর্গাপুর, সালানপুর অঞ্চলে সম্ভবত নলকূপ হয় না, লেখকের নজরে পড়ে নি।

বীরভূম

৬০ মিটার—নলহাটি, রামপুর ও নানুর (জেট টাইপ লাগে)। বাকি জেলায় নলকূপ হয় না।

দার্জিলিং

৪০ মিটার—ফাঁসীদেওয়া, খড়িবাড়ি, (ইঁদারা অঞ্চল নকশালবাড়ী, শিলিগুড়ি)। পার্বত্য এলাকায় জলের উৎস ঝরণা।

খ : স্বাস্থ্যবিধি ও জল নিষ্কাশন

শুচি প্রযুক্তির (Sanitation) মূল লক্ষ্য হল খাটা পায়খানা ও নদী-নালা-পুকুরকে ওই উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ রেখে স্যানিটারি পায়খানার প্রচলন করা যাতে অন্যান্য কার্যে ব্যবহার্য জল দুষিত না হয়ে ওঠে। পানীয় জলের পুকুরে স্নান, কাপড় কাচা, বাসন মাজা বা গরু মোষ ধোয়ান নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। তবে এগুলি সবই অভ্যাস পাল্টানোর ব্যাপার যা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে সামাজিক আন্দোলন ও পঞ্চায়েতী অনুশাসন। প্রযুক্তিগত ভাবে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু বক্তব্য নেই। স্যানিটারী পায়খানার প্রযুক্তি পরবর্তী অধ্যায় 'গ্রামীণ আবাসনে'র মধ্যে দেওয়া হয়েছে কারণ এই সব পায়খানা তৈরী করতে হবে ব্যক্তিগত মালিকানায়। এগুলি আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যে পড়বে না। বৃহত্তর কোলকাতায় অবশ্য সি. এম ডি. এ. তাঁদের নিজস্ব ডিজাইনে ঢালাই প্যানেল দিয়ে তৈরী এই ধরনের পায়খানা যোগাচ্ছেন মালিকদের খাটা পায়খানার পরিবর্ত হিসাবে। মোট খরচ পড়ে ২০০০ টাকা। মালিককে জমা দিতে হয় ৫০০ টাকা। বাকিটা সি. এম. ডি. এ. দেন অনুদান হিসাবে। জিনিষটা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে চমৎকার, সাধারণ মানুষের কাছে কদরও পাচ্ছে। কিন্তু বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে এ জিনিষ যোগাবার মত আর্থিক শক্তি সম্পন্ন সংগঠন কোথায় ? সি. এম.ডি. এ র এই পরিসেবা গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করা যায় কিনা সরকার ভেবে দেখতে পারেন (প্রস্তাবটা বোধ হয় To develope Calcutta, stop developing Calcutta স্লোগানের মত হয়ে যাচ্ছে !)

আপাততঃ স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার খাতে আঞ্চলিক প্রযুক্তি হিসাবে অন্যান্য যা করা যায়, তা হল :

(১) হাজা মজা কচুরীপানায় ভরা পুকুরের সংস্কার।

(২) গ্রামের পথে ডোবায় জমে থাকা নোংরা বদ্ধ জল বের করার জন্য পয়ঃপ্রণালী কাটা।

(৩) নিয়ম করে গ্রামের সর্বত্র পরিশোধক ওষুধ ছড়ানো।

আসলে পুনর্গঠন কোন একটা এককালীন প্রচেষ্টা নয়। এটিকে একটি বিরামবিহীন পদ্ধতি (Continuous Process) হিসাবে গ্রহণ করতে হবে প্রকল্পকদের। মনে রাখতে হবে গড়ার শেষ নেই ; শেষ নেই উন্নতির।

পুষ্করিণী উন্নয়নের জন্য ১৯৩৯ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে এক পশ্চিমবঙ্গেই অন্ততঃ পাঁচ পাঁচটা আইন হয়েছে। তবু উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নি। বাধাগুলি নিম্নরূপ :

(১) উত্তরাধিকার আইনে মালিকের দেহান্ত হলে পুকুরগুলি বংশধরদের এজমালি সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বারোয়ারীপুকুরের পঙ্কোদ্ধারে উৎসাহ বোধ করেন না কেউই। এগুলি হেজে মজে কচুরী পানায় ঢেকে গিয়ে মশাদের স্বাস্থ্য নিবাস হয়ে ওঠে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ম্যালেরিয়াকে দেশছাড়া করে ছিলেন। অসুখটি আবার এসে জাঁকিয়ে বসেছে। এই প্রত্যাবর্তনে মজা পুকুর ও কচুরীপানার অবদান কম নয়।

(২) জমিদারী উচ্ছেদের সাথে অনেক পুকুরের মালিকই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। মালিকহীন অনাথ পুকুরগুলির দুর্দশার একশেষ।

(৩) মাছ চাষে যত উৎসাহ তার সিকিভাগও নেই পুকুর সংস্কারে।

(৪) ইচ্ছে থাকলেও অর্থাভাবে সংস্কার করতে পারেন না অনেকেই।

পঞ্চায়েতের উচিত এলাকার সমস্ত অবহেলিত পুকুরগুলির তালিকা প্রণয়ন করে সরকারী আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা। অধিগৃহীত পুকুরগুলির সংস্কার করতে পঞ্চায়েতের যে টাকা লগ্নী করতে হবে, তা খুব সহজেই মাছ চাষের মাধ্যমে তুলে আনতে পারবে পঞ্চায়েত। মাছ চাষের লাভ জানতে হলে সপ্তম অধ্যায়টা পড়ুন। মাছ চাষের ইজারা ও ঋণ দিয়ে পঞ্চায়েত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের বাড়তি আয়ের পথও খুলে দিতে পারবেন একই সঙ্গে। পুকুর কাটার প্রযুক্তি আগেই বিবৃত হয়েছে (৬ নং নকশা)। নিকাশী নালা কাটতে হলে সেচ খালের মতই পরিকল্পনা রচনা করতে হবে সামগ্রিক অঞ্চলের জরিপ করিয়ে নিয়ে। পরিশোধক ছড়াতে হলে অবশ্যই তার যোগান চাই। উৎসাহী প্রকল্পক পঞ্চায়েত নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারেন ডি. ডি. টি. বা ফিনাইল। খরচ প্রায় অর্দ্ধেকে নেমে আসবে। পরিশোধক প্রস্তুতের সংক্ষিপ্ত প্রযুক্তি এখানে দেওয়া হল।

ডি. ডি. টি. (স্প্রে জাতীয়)

কাঁচামাল—কেরোসিন (দু বোতল), ন্যাপথলিন পাউডার (২৪০ গ্রাম), ক্রিয়োজোট তেল (৭৫ গ্রাম), পাইথারেম ও সিট্রোনেলা তেল (১০০ গ্রাম করে), কার্বলিক অ্যাসিড (১ ড্রাম)।

সব কিছু মিশিয়ে খুব ভাল করে ঘুলিয়ে নিতে হবে। স্প্রে করে দিন। গ্রাম থেকে মশা, মাছি, আরশুলা, ছারপোকা সব সাফ হয়ে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডি. ডি. টি. ব্যবহার করবেন না। ডি. ডি. টি. পরিবেশ দূষিত করে।

ফিনাইল

কাঁচামাল—রজন (১০ কেজি), ক্যাষ্টর অয়েল (৪ কেজি), ক্রিয়োজোট তেল (৩৫ লিটার), কষ্টিক সোডা (২ কেজি), কার্বলিক অ্যাসিড (৭৫ গ্রাম), জল (৩০ লিটার), পটাশিয়াম পার্মাগানেট (৫ কেজি)।

প্রথমে রজন ও ক্যাষ্টর অয়েল লোহার কড়ায় অল্প জাল দিন। রজন গলে গেলে, ১০ লিটার জলে কষ্টিক সোডা গুলে মেশান। মেশাবার সময় মিশ্রণটাকে ক্রমাগত নাড়তে হবে। কিছু বাদে কড়া থেকে ২/৪ ফোঁটা তুলে জলে ফেলে দেখুন রং সাদা হয়ে যাচ্ছে কিনা। আরো কিছুটা জল দিয়ে জাল দিয়ে যান। জল মরে ১½ কেজি মত হলে নামিয়ে ঠাণ্ডা করুন ও ক্রিয়োজোট তেল, কার্বলিক অ্যাসিড ও বাকি জল অল্প অল্প করে মেশান। পটাশ পার্মাঙ্গানেটও মেশান। ফিনাইল তৈরী।

গ: বন্যারোধক প্রকল্প

মেদিনীপুরের ময়না অঞ্চলে ১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর এক বেসরকারী সমীক্ষায় পাওয়া কয়েকটি তথ্যের উপর নির্ভর করে এখানে একটি বন্যারোধক প্রকল্পের প্রযুক্তিগত রূপরেখা তুলে ধরা হল। যে কাল্পনিক গ্রামটির ছবি দেওয়া হল ৮ নং নকশায়, সামান্য অদল বদল করে দিলে সেটি আপনার গ্রামের ছবিও হয়ে উঠতে পারে। সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যগুলি এই রকম:

(ক) বন্যার তোড় এসেছিল উত্তর থেকে, বেশীর ভাগ দেয়াল পড়েছিল দক্ষিণমুখী হয়ে। বান আসার পথে যেখানে ঘরের উত্তরে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে বাধা পেয়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দেয়াল সেখানে পড়ে নি।

(খ) ভাঙ্গা ঘরের ৮০ শতাংশেরই মাটির দেয়াল, টালির ছাদ। বেড়ার দেয়াল ও খড়ের বা টিনের হালকা চালযুক্ত ঘরের ক্ষতি হলেও ভেঙ্গে পড়েছে কম।

(গ) দেয়াল ভেঙেছে দুভাবে—এক, জলের ধাক্কায় উল্টে গেছে বন্যার প্রথম চোটে ; দুই, জলের স্রোতে তলা ক্ষয়ে গিয়ে দেয়াল বসে গেছে জল কমার সময়।

(ঘ) যে সব বাড়ীর মেঝের উপর জলে ওঠে নি তার ৯৫% অল্পবিস্তর ক্ষতি হলেও অটুট রয়ে গেছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে জল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে—ধ্বংস ও ক্ষতির পরিমাণ সেখানে ব্যাপক।

(ঙ) পাকা দালানের ঢালাই ছাদের পরই টেঁকসই বলে প্রমাণ হয়েছে পলিথিন ঢাকা দরমা, ত্রিপল ও খড়ের হালকা ছাদ। পোড়া মাটির টালি ভারী ও নড়বড়ে বলে ভেঙ্গে পড়েছে সর্বাগ্রে।

(চ) আশ্চর্য! মজবুত নিশ্ছিদ্র ঘরগুলি ভেঙ্গে গলে গেছে অথচ অপলকা গোয়ালের চালা বা চণ্ডীমণ্ডপের খোলা দাওয়া দাঁড়িয়ে রয়ে গেছে। এই সব চালায় দেয়াল না থাকায় বা দরজার ঝাঁপ না থাকায় আসা যাওয়ার পথে জলস্রোতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হয়নি।

(ছ) বন্যা আসার পথে বাড়ীর পাশে অপলকা বড় গাছ ছিল যেখানে, জলের তোড়ে গাছ পড়েও সেসব বাড়ীর ক্ষতি কম হয় নি।

(জ) গ্রামীণ পঞ্চায়েত অফিস, ডিসপেনসারী, প্রাথমিক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরীগুলি উপেক্ষিত ও জরাজীর্ণ অবস্থায় প্রথম আঘাতেই লুটিয়েছে জলের বুকে। অথচ শহর বা আধা শহর অঞ্চলে এইসব প্রতিষ্ঠানই তাদের পাকা দালানে বা ছাদে আশ্রয় দিয়েছে হাজার হাজার মানুষকে।

(ঝ) বন্যার অব্যবহিত পরেই খাদ্যের থেকে বেশী অভাব দেখা দিয়েছে জ্বালানী কাঠকুটো, নুন ও পশুখাদ্যের। খুব কম বাড়ীতেই এগুলি শুকনো এবং সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত ছিল।

(ঞ) বন্যাকালে উঁচু রেল লাইনগুলি মানুষের সাময়িক আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। দূরের ষ্টেশন থেকে এদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় হালকা ট্রলি এবং ডিঙ্গি পাওয়া গেলে রিলিফ ব্যবস্থা আরো ব্যাপক করা যেত।

(ট) বানের সময় মানুষ আশ্রয় নেয় উঁচু বাঁধ বা ডাঙ্গা জমিতে বেশ খানিকটা বিশৃঙ্খল এলোমেলো ভাবে, যে যেখানে পারে। এই বাঁধে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে সিভিল ডিফেন্সের মত নির্দিষ্ট ছকে

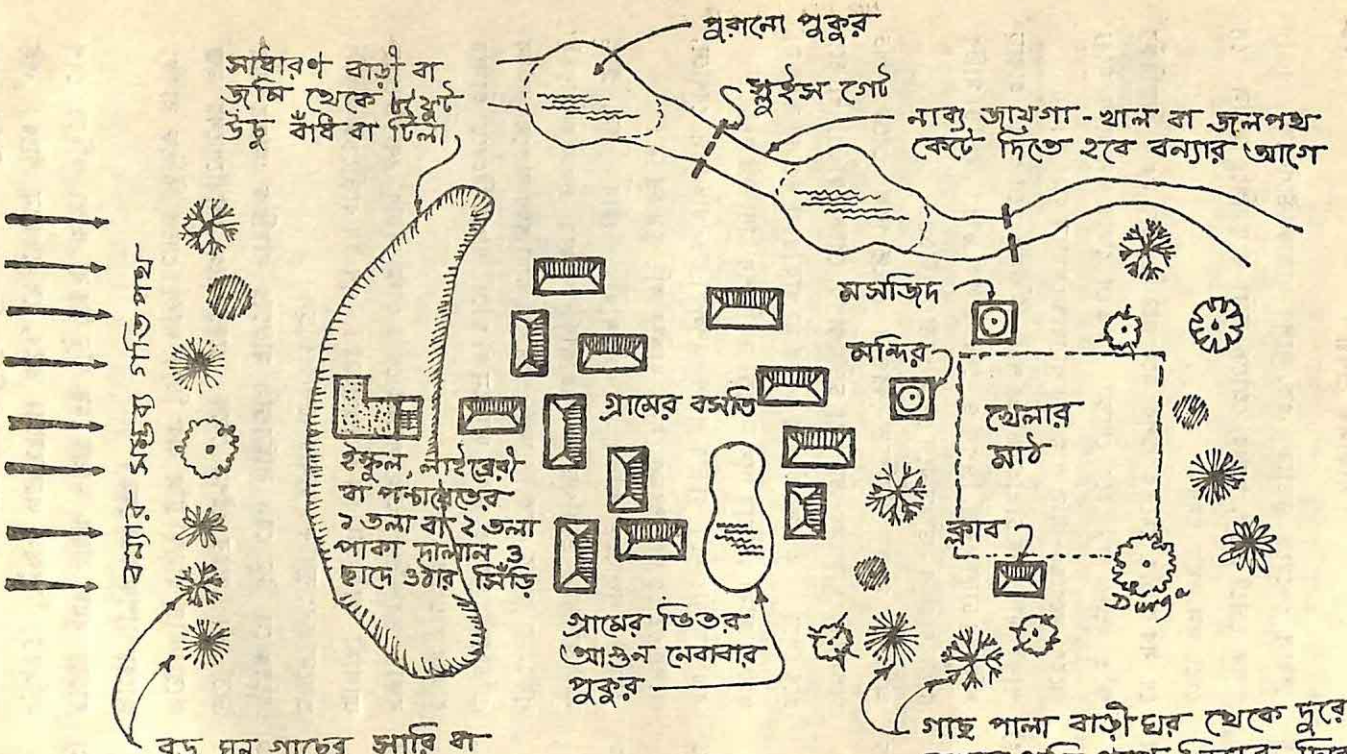

৮নংনকশা-প্রকল্পায়িত গ্রাম (কাল্পনিক)

ফেলা প্ল্যান মাফিক আগে ভাগেই সকলকে যদি ট্রেনিং দিয়ে রাখা হয় তাহলে বিপদের দিনে কষ্ট বেশ খানিকটা কমে।

এইসব তথ্যের মাঝে লুকিয়ে আছে বিপদের মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি প্রযুক্তি। টুকরো টুকরো ভাবে। সেগুলিকে একত্র করে সুষ্ঠ রূপ দিতে পারলে রচিত হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়বার একটা সামগ্রিক মাষ্টার প্ল্যান বা মূলছক। ময়নার তথ্যগুলি থেকে গ্রাম পরিকল্পনার নতুন এক আঙ্গিক খুঁজে পাওয়া যায়। অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বে গ্রামীণ আবাসন সমবায় গড়ে, তার মাধ্যমে প্ল্যান মাফিক (৮ নং নকশা) তৈরী করতে হবে নতুন গ্রাম—টেষ্ট রিলিফ্ বা খাদ্যের বিনিময় কাজ (Food for work) প্রথায়। ইটভাটা, চ্যাটাই ও দরজা জানলা তৈরীর গোলা গড়ে তুলতে হবে গ্রাম্য মজুর ও ছুতোর দিয়ে। সরকার যোগাবেন সিমেণ্ট, টিন, অ্যাসবেষ্টস, কয়লা। বাঁশ ও কাঠ কেনা হবে গ্রামের বাগান থেকে। গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সফররত সরকারী ব্লক ওভারসিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশে তৈরী করবেন ঘরবাড়ী। পরিবর্তে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পাবেন সরকারী কোটা অনুযায়ী চাল, গম, আটা এবং অল্প হাত খরচের টাকা।

অনেকটা এই ধরনের প্রকল্পে, বাড়ীপ্রতি ১,০০০ টাকা অনুদান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৭৮-৭৯ সালে ৫২,৫০০ ও ৭৯-৮০ সালে ২০,০০০ পরিবারের পুনর্বাসন করেছেন পনেরোটি জেলা জুড়ে গ্রামীণ কর্মসূচী প্রকল্প, 'খাদ্যের বিনিময় কাজ', 'গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তাঘাট, নালানর্দমা তৈরী করে বাসোপযোগী প্লটে মালিকের দেওয়া শ্রম ও সরকারী অনুদানে কেনা মালমশলায়। ৩২৪২টি পঞ্চায়েতের প্রতিটিতে গড়পড়তা ১৮ থেকে ২০টি পরিবার এইভাবে পেয়েছে তাদের আস্তানা, যার প্রতিটিতে আছে শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, বারান্দা। এই 'নবগ্রাম'কে গড়ে তুলতে হবে উঁচু জায়গায়, বাঁধ বা প্রাকৃতিক টিলা ও জঙ্গলের আড়ালে। এগুলি বন্যার স্রোতের জোর কমিয়ে দেবে। বাড়ীগুলি জোরালো ধাক্কার হাত থেকে বেঁচে যাবে। এই বাঁধ, টিলা ও জঙ্গল ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকেও রক্ষা করবে গ্রামকে। ৮নং নকশায় দেখুন বসতির আশেপাশে গাছপালা খুব কম যাতে ঝড় জলে পড়ে গিয়ে বাড়ীঘর না ভাঙে। স্কুল, লাইব্রেরী, ডিস্‌পেনসারী ও পঞ্চায়েত অফিস গড়ে তোলা হয়েছে টিলার উপর পাকা বাড়ীতে। এরা হবে বন্যার সাময়িক আশ্রয়। এদের ছাদ হবে কংক্রিটের। থাকবে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। দোতলা

করতে পারলে সোনায় সোহাগা। খুব উচু জলোচ্ছ্বাস হলেও মানুষ আশ্রয়হীন হবে না। মন্দির, মসজিদ, চণ্ডীমণ্ডপ, ক্লাব ও কিছু এজমালি আম কাঁঠালের বাগান কিন্তু রাখা হয়েছে বন্যার গতিপথের নীচের দিকে ফাঁকা খেলার মাঠকে ঘিরে। ঝড় জলে বিপদ ঘটাবে না এই বাগান। পুজো, মেলা, খেলা কি যাত্রা জমে উঠবে এই মাঠ ও বাগানের আশেপাশের ক্লাব-মন্দির-মসজিদে। হাটও বসতে পারে। থাকতে পারবেন ভিনগাঁয়ের দর্শক, দোকানী, খেলোয়াড় বা যাত্রাপার্টি। গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে এক বা একাধিক পুকুর থাকবে বসতির ভিতর আগুন নেবানোর প্রয়োজনে। আশেপাশের নীচু যায়গা, ডোবা, বিল খাল কেটে যুক্ত করে তৈরী করা যায় নিকাশী যাতে বন্যার জল গ্রাম না ভাসিয়ে ওই পথে বয়ে যায়। এই খালে স্লুইস গেট লাগিয়ে খরার জলসেচের ব্যবস্থাও করা যায়। ৭৮-এ বন্যা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আসুন এবার আমরা কেড়ে নি তার কাছে অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা।

ঘ : পথ ও যানবাহন

যে কোন বসতির পক্ষে তার পথঘাটই হচ্ছে তার স্নায়ুমণ্ডলী, যা তার বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য। অথচ পশ্চিমবাংলার গ্রামদেশে পথঘাটের অবস্থা অতি শোচনীয়·· তার বেশীর ভাগই জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৫ মাস

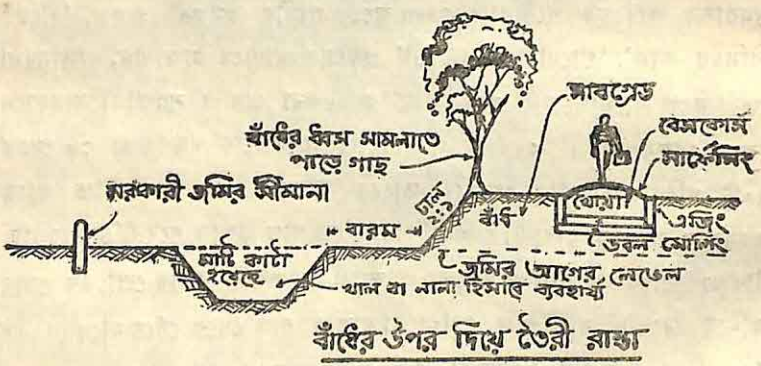

৯নং নকশা

ব্যবহারোপযোগী থাকে না। একদিন তবু জলপথের বহুল ব্যবহার ছিল, আজ তাও নেই। না ভিন্নাঞ্চলের কয়লা, কেরোসিন, কাপড় নুন, তেল আসতে পারে, না গ্রামের উৎপন্ন ফসল, দুধ, আনাজ, হাঁড়িকুড়ি ভিন্নাঞ্চলে

যেতে পারে। কাজেই পঞ্চায়েত বা গ্রামপ্রকল্পকের পয়লা ডিউটি হল রাস্তা-ঘাটগুলিকে এমন স্তরে উন্নত করা যাতে সারা বছর যানবাহন চলাচল করতে পারে। রাস্তাগুলি বাঁধের উপর দিয়ে করতে পারলে বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবে (৯ নং নকশা)। এতে উপরি পাওনা একটা সমান্তরাল নিকাশী খাল

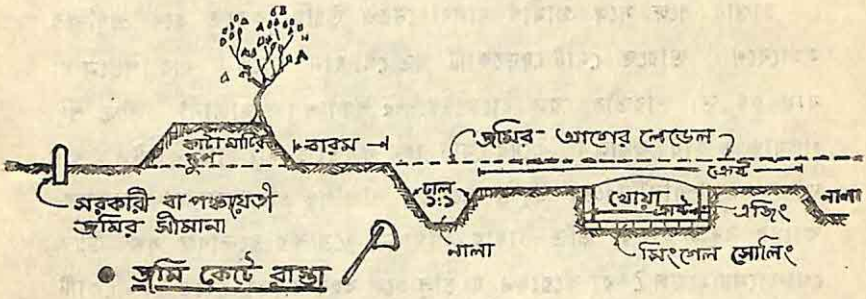

১০নং নকশা

প্রায়শই তৈরী হয়ে যায়। সব সময় এরকম সম্ভব নয়। ঢাল মেলাতে জমি কেটেও রাস্তা করতে হয় (১০ নং নকশা)। সেক্ষেত্রে কাটা মাটির স্তূপ দিয়ে বন্যা রোধক বাঁধ দিলেও অনেক ক্ষেত্রে বন্যার হাত থেকে রাস্তা রেহাই পাবে।

রাস্তার তিনটি অংশ—(১) সাবগ্রেড বা বুনিয়াদ, (২) বেসকোর্স বা সোলিং ও ঝামা পেটানো স্তর এবং (৩) সার্ফেসিং বা পীচ বাঁধানো অংশ। গ্রামীণ প্রযুক্তির মধ্যে বিশেষ ভাবে পড়ে প্রথমটি এবং সময় সময় পড়ে দ্বিতীয়টি। তৃতীয়টি পূর্তবিভাগের দায়িত্ব। সাবগ্রেড বা বুনিয়াদের মাটি ভরার কাজে ফাঁকি থেকে গেলে ভবিষ্যতে রাস্তাটিকে ভাল করা যাবে না। এই জন্য মাটির কাজ শেষ হলে ২।৩ টি বর্ষার জলে তাকে বসিয়ে নিয়ে তারপর বেসকোর্সের সোলিং, এজিং ও ঝামা পেটানোর কাজে হাত দিতে হয়। মাটি কাটার কাজ ঠিক বর্ষার পরই করতে হয় ; ভিজে মাটি কাটাও সোজা, বাঁধে জমাট বাঁধেও তাড়াতাড়ি। বাঁধের উচ্চতা বেশী হলে তা একবারে না করে দু-বছরে ফেলা উচিত। বেসকোর্সে বাঁকুড়ায় মুরাম, পুরুলিয়া ও দার্জিলিং-এ পাথর কুচির ব্যবহার চলিত। ক্রাষ্ট (১০ নং নকশা) তিন মিটার চওড়া হওয়া উচিত, ক্রেষ্ট ৭·৫ মিটার হলেই ভাল। নতুন প্রযুক্তি মতে মাটির সঙ্গে সিমেন্ট (১০ : ১) মিশিয়ে এক বেসকোর্স হয় যাতে সার্ফেসিং বাদ দেওয়া যাবে। ফলে খরচ ও পরিশ্রম বাঁচবে বেশ অনেকটাই। যে সব গ্রামের

পাশ দিয়ে সেচ খাল গেছে সেখানে প্রকল্পকরা জলপথের পুনঃপ্রচলনের কথা ভেবে দেখতে পারেন। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখব কৃষি জঞ্জাল থেকে যে জ্বালানী তৈরী হতে পারে তা দিয়ে নৌকায় ফিট করা ইঞ্জিন চালানো যাবে··· কৃষিপণ্যের এই রকম নৌ-পরিবহন খুব সস্তা ও উপযোগী হবে।

রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ যানবাহনেরও উন্নতি করতে হবে প্রযুক্তির সমাবেশে। ভারতে মোট দেড়কোটি মত গো-যান আছে। এর পিছনে যা ব্যয় হয় তা ভারতীয় রেল বাজেটের ৭৫ শতাংশ। জ্বালানী বলতে শুধু পশুখাদ্য ও কৃষি জঞ্জাল। এদের মোট বহন ক্ষমতা ১০০ কোটি কুইন্টল মত। ডানলপ কোম্পানী তাঁদের প্রযুক্তি প্রয়োগে আগুপিছু ভারসাম্য রাখতে পারে, কাঠের বদলে হাওয়া ভর্তি টায়ার লাগানো, ব্রেকের বন্দোবস্ত যুক্ত উন্নত গো-যানের মডেল তৈরী করেছেন যা চালু হলে বহন ক্ষমতা বেড়ে ২৫০ কোটি কুইন্টল হতে পারবে – একই খরচে। বহন ক্ষমতা আরো বাড়তে পারে যদি উন্নত জোয়াল, লাগাম, আলো ও গীয়ার নিয়ে প্রযুক্তিগত গবেষণা করা হয়। উত্তরপ্রদেশে টায়ার ও ব্রেক লাগানো টাঙ্গা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের গ্রামীণ পরিবহনেও এ ধরনের টাঙ্গা ও এক্কা চালানোর যথেষ্ট অবকাশ ও সুযোগ আছে। সাইকেল রিকসায় গীয়ার ও মোপেডের ছোট্ট ইঞ্জিন লাগানো তো খুবই সহজ প্রযুক্তি। এইসব প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পরিবহন সস্তা হবে, আরামদায়ক হবে এবং হবে গতিসম্পন্ন।

সাধারণভাবে যে কোন প্রযুক্তির বহুমুখী (Multipurpose) প্রয়োগ সম্ভাবনা থাকলে তার সাফল্য অধিকতর নিশ্চিত। পাঞ্জাবে ডিজেল ট্রাক্টরকে পরিবহনের কাজে লাগানো হয় সস্তায়। এই কারণে ডিজেল ট্রাক্টর সেখানে জনপ্রিয় হতে বাধ্য। আমাদের প্রকল্পরাও ভেবে দেখতে পারেন এই প্রযুক্তিগত কৌশলের। ট্রাক্টর চাষ করে এক দিন, বসে থাকে বিশ দিন।

ঙ ঃ পরিবেশ দূষণ দমন

পরিবেশ দূষণ বা পলিউসান এখনো আমাদের গ্রাম এলাকাকে খুব মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে নি। তবে গ্রামীণ পরিবেশেও ক্রমে শিল্প বিস্তার হচ্ছে। কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজেল, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক। সবুজ বিপ্লবের নেশায় জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো হচ্ছে। এ সবেরই অবশ্যম্ভাবী ফল বাতাসে কারবন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি, উষ্ণতর আবহাওয়া,

খরা। এখন থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রত্যেক আঞ্চলিক প্রকল্পে রাখতে হবে খোলা জায়গা ও বনাঞ্চল (৮ নং নকশা)। খোলা জায়গা থাকবে ৫ দফা :

(১) বসতির আশেপাশে-সব্জীবাগান, উঠান।

(২) খেলার মাঠ, হাট বা মেলার স্থান।

(৩) দুই গ্রামের মাঝে সবুজ গোচারণভূমি।

(৪) ভবিষ্যৎ বসতির স্থান (এখন থেকে রেখে গেলে ভবিষ্যতে ঘিঞ্জি বসতি পরিবেশ দূষিত করবে না।)

(৫) জলাশয়-খাল, বিল, পুকুর, নদী—পরিবেশ ঠাণ্ডা রাখবে।

আর একটা প্রযুক্তিগত কৌশল এখন থেকেই গ্রামের ঘরে ঘরে চালানোর, খুড়ি, জ্বালানোর চেষ্টা করা উচিত। তা হল বায়োগ্যাস, যাতে পরিবেশ দূষিত হয় নাম মাত্র। দিল্লীর ওখলাতে নর্দমার ময়লা থেকে ১৭০০০ ঘনমিটার বায়োগ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে প্রতিদিন, যার দাহিকা শক্তি এক কোটি লিটার' কেরোসিনের থেকেও বেশী। অভাবে ধূমহীন চুল্লীও চালানো যেতে পারে। তৎ-অভাবে ধূমহীন গুল কয়লা। পরিবেশ নির্মল রাখতে এরাও বেশ কার্যকরী। আর এদের নির্মাণ প্রযুক্তিও খুবই সরল। বিপদ ঘাড়ে এসে পড়ার আগেই হাতিয়ার নিয়ে তৈরী থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চ : কৃষি প্রকল্প (আঞ্চলিক)

গ্রামোন্নয়নে কৃষি প্রকল্পের স্থান সর্বাগ্রে। তবে আমরা এখানে তাকে ষষ্ঠ স্থান দিলাম কেন? গত তিন দশকের ঐকান্তিক চেষ্টায় আজ আমরা সত্যি এক সবুজ বিপ্লব ঘটাতে পেরেছি। কৃষি প্রযুক্তি দিয়েছে উচ্চ উৎপাদনশীল সঙ্কর বীজ, নানান রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, শস্য চক্র (Crop rotation) ও চাষের নানান কৌশল। প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আমাদের চাষীভাইরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। তাই আমরা অন্যান্য আঞ্চলিক প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কৃষিক্ষেত্রে এখনো যা করণীয় রয়ে গেছে তা হল :

(ক) যান্ত্রিক চাষের অধিকতর প্রচলন। ফলন বাড়বে। যেমন ধরুন কোদাল। একটি অতি শ্রমসাধ্য যন্ত্র। কিন্তু এর নতুন ডিজাইনে কোমর না বাঁকিয়ে এক পায়ের মারফৎ দেহের ওজন দিয়ে অতি অল্পায়াসে চালানো যাবে যে কোদাল তাতে কাজ পাবেন তিন গুণ।

(খ) এক-ফসলা জমিকে দো-ফসলায় পরিণত করা, সেচের উন্নতি করে। উৎপাদন বাড়বে।

(গ) কৃষিভিত্তিক শিল্পের বহুল প্রচলন। এতে কৃষিবর্গের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুততর হবে।

(ঘ) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে শস্য ব্যাঙ্ক বা ধর্মগোলা (৪নং চিত্র) মারফৎ। ধর্মগোলা চাষীদের একটি চমৎকার দেশজ সমবায় ব্যাঙ্ক যেখানে প্রতি অংশীদার তাঁর ফসলের নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখতে বাধ্য ও প্রয়োজনে বীজ ধান ইত্যাদি বাবদ ধার নিতে সক্ষম। ধর্মগোলা অংশীদারদের মহাজনের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচায়। এ বই-এ কোথাও আমরা পিছন ফিরে তাকাই নি। কেবল কৃষি ঋণের কথায় ইতিহাস আলোচনা না করে পারছি না—এতই গৌরবময় সে কাহিনী। ভারতে ১৯১৩ সালে প্রথম কৃষি ঋণের প্রচলন করেন রাজসাহীর কালিগ্রামস্থ পতিসর ব্যাঙ্ক। এ ব্যাঙ্কের স্রষ্টা কে ছিলেন জানেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যিনি নোবেল প্রাইজের ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকার পুরোটাই এই ব্যাঙ্কে জমা দেন চাষীদের উপকারার্থে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল মহাজনরা তাঁদের কারবার গুটিয়ে পতিসর ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করতে সুরু করেছিলেন।

যান্ত্রিক চাষ, দো ফসলা চাষ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিষয় অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি; তাই এখানে ইতি করলাম।

মূল্যায়ন—যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের স্তরে স্তরে মূল্যায়ন করতে হয় উদ্দেশ্য, সময়ভিত্তিক অগ্রগতি ও সাফল্যের। মূল্যায়নের রিপোর্ট ভাল মন্দ যাই হোক সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যাতে সকলেই তা থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। উদ্দেশ্য ও সাফল্য মূল্যায়ন হয় সমীক্ষা মারফৎ জনমত নিয়ে। অগ্রগতির মূল্যায়ণ করতে হবে কর্মীদের রিপোর্টের গ্রাফ ও চার্ট তৈরী করে। পূর্ববর্তী প্রকল্পের মূল্যায়ন বিশেষ প্রয়োজন পরবর্তীর রূপায়ণে।

এত সব ঢাক ঢোল পিটানোর পরও প্রশ্ন থেকে যায় এ সবই তো জানা কথা; চর্বিত প্রযুক্তির পুনঃচর্বন। এতে নতুনত্বটা কি হল? এ সমালোচনার উত্তরে শুধু বলতে পারি, আজ্ঞে হ্যাঁ, এ সব প্রযুক্তিই আমাদের জানা, পরিচিত, পুরাতন। নতুনত্ব কেবল নব সমন্বিত উপস্থাপনায়, প্রয়োগ কৌশলে। পানীয় পুরানো, পরিবেশনের পাত্রটি নতুন—গ্রামীণ প্রয়োগের উপযুক্ত।

৩

গ্রামীণ আবাসন

আই. আই. এইচ. টি (ইণ্টারন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ হাউসিং টেকনলজী)-এর মতে এই শতকের শেষে পৃথিবীতে মানুষের দল ৭০০ কোটিতে দাঁড়াবে। এই জনসমুদ্রকে ঘরবাসী করতে হলে রোজ ৭৪,০০০ বাড়ী তৈরী করা দরকার। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে এসে যেদিন পয়লা আস্তানাটি গড়েছিল, সেদিন থেকে আজ অবধি যত মালমশলা লেগেছে বাড়ী তৈরীর কাজে, আগামী দুই দশকে দরকার হবে ঠিক ততখানিই। ইট, কাঠ সিমেণ্ট আর টিন দিয়ে এ দরকার মেটানো অসম্ভব। উপায় ?

উপায় একটাই—পায়ের তলার মাটিকে কাজে লাগানো। ইতিহাসের সবচেয়ে পুরানো বাড়ী তৈরীর উপকরণ মাটি আজও সব উপকরণের থেকে সস্তা। অফুরন্ত এর যোগান। তাপ-রোধক শক্তি এর অসীম। মাটির একটাই দোষ—তার সীমিত জল-রোধক শক্তি। মাটির দেয়াল সহজেই জলে গলে কাদা হয়, ভেঙ্গে পড়ে। ফলে পশ্চিমবাংলার মত অঞ্চলে যেখানে বছরের বেশীর ভাগ সময় বর্ষা আর বানভাসী লেগেই আছে, সেখানে সাধারণ মাটির ঘরের আয়ু বড়ই কম, তদারকী বড়ই বেশী। এর জলরোধক শক্তিকে বাড়াতে পারলে এ বিপদের সমাধান হতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বন্যা-রোধক প্রকল্পে উল্লেখিত ময়নায় পাওয়া তথ্যগুলির মাঝ থেকে টেনে বার করতে হবে মাটির টেঁকসই বাড়ী তৈরীর ফরমূলা। নদীর বান ছাড়াও প্রাকৃতিক অভিশাপে যে সব বিপদ ঘটে থাকে, ভূমিকম্প ও আগুন লাগা তাদের মাঝে খুবই চলতি। আসামে ভূমিকম্প বেশী হয়, সেখানে হাল্কা টিনের চাল ও হাল্কা কাঠের কাঠামোর উপর অ্যাসবেষ্টস বা সিমেণ্ট-বালির প্রলেপ দেয়া দরমার দেয়ালের যে চলন আছে তাকে উৎসাহ দেয়া উচিত।

দমকলহীন পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড বড় ভয়াবহ ঘটনা। প্রকৃতির দয়া, গ্রামাঞ্চলের পয়লা বাড়ী তৈরীর উপকরণ মাটিকে আগুন বিশেষ কাবু করতে পারে না। পল্লী বাংলার আবাসনকে সুঠাম করে গড়ে তুলতে হলে, মাল-

মশলা বাছাই ও কারিগরী কৌশলের মধ্যে তাকে করে তুলতে হবে—(১) তাপ ও আগুন-রোধক, (২) জল ও বানরোধক এবং (৩) সস্তা।

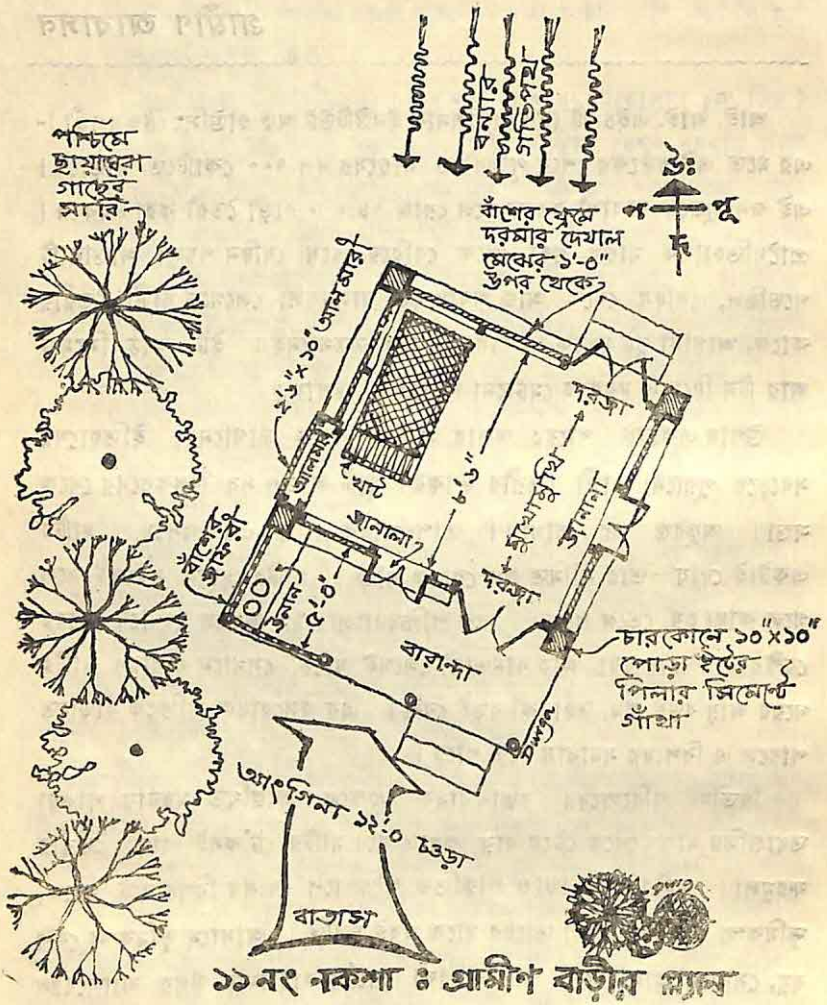

১১ নং নকশা ঃ গ্রামীণ বাড়ীর প্ল্যান

এই ফরমুলা ধরে গড়ে তোলা এক কুটিরের পরিকল্পনা ও নির্মাণ শৈলী (প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলি সমেত) ব্যাখ্যা করা হল এখানে ১১ ও ১২ নং নকশা সহযোগে ঃ

এক ঃ নকশা—বর্ষা প্রধান গ্রাম বাংলার গুমোট আবহাওয়ায় ঘরে বাতাস

চলাচলই প্রধান বিবেচ্য। এদেশে গ্রীষ্মে হাওয়া বয় দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর, উত্তরপূর্বে। জানালা দরজা দক্ষিণ ও পূর্বমুখী হওয়া উচিত যাতে ঘরে প্রচুর বাতাস ও রোড় আসে। জানলার তলাটা নীচু (১ ফুট বা কম) হওয়া দরকার যাতে মেঝের উপর প্রচুর হাওয়া খেলে। গেঁয়ো মানুষ মেঝেতে শুয়ে বসে কাটাতে অভ্যস্থ। গুমোট আবহাওয়ায় শরীরে চলন্ত বাতাসের ছোঁয়া লাগলে ঘাম শুকোয়, আরাম দেয়। অথচ গ্রামীণ কুঁড়ের ৯৫ শতাংশের জানলাই মেঝে থেকে সাড়ে তিন-চার ফুট উচুতে অবস্থিত ঘুলঘুলি বিশেষ। জানলার মাপ খাড়াইয়ে ৪ ফুট ও চওড়ায় ২½ ফুট হতে হবে। একটা দক্ষিণে এবং একটা পূবে হলে ভাল। ঘরে একটা দেয়াল আলমারী থাকা প্রয়োজন। এর ন্যূনতম মাপ চওড়া ২½ ফুট, গভীরতা ১০ ইঞ্চি। ৪/৫টি তাক থাকবে। বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক উন্নতি গ্রামবাসীকে উপহার দিচ্ছে নতুন নতুন সম্পত্তি—ট্রাঞ্জিষ্টার রেডিয়ো, চামড়ার জুতো, সাইকেল বা মোপেড, সস্তা ক্যামেরা, স্নো-পাউডার-আয়না-সাবান-ফুলেল তেল-নেলপালিশ-লিপষ্টিক-সেন্ট, সেফটি রেজার, ভটপেন এবং শিক্ষা সচেতন ছেলেমেয়েদের বেশ কিছু বই-খাতা-পেন্সিল। সাবেকি হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর ঝাঁপি, রামায়ণ, কোরাণ, মহাভারত, মনসার পাঁচালী তো আছেই। আলমারীর প্রয়োজন বাড়তেই থাকবে। দরজার মাপ ৬ ফুট × ২ ফুট ৯ ইঞ্চির কম করা চলবে না। ঘর, বারান্দা ও আঙ্গিনার ন্যূনতম মাপ একটা আছে, তার কম হলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে : বারান্দা ৫ ফুট চওড়া, ঘর সাড়ে আট ফুট, অঙ্গন ১২ ফুট। মিটারে হিসাবে যথাক্রমে ১·৫, ২·৬ ও ৩·৬। আপনার দক্ষিণটা থাকবে খোলা। পশ্চিমে ছায়াঘেরা গাছের সারি। শীতে পাতা ঝরে যায় এমন গাছ লাগালে মে-জুন মাসে বাড়ী ঠাণ্ডা থাকবে ছায়ার আওতায়, ডিসেম্বর জানুয়ারীতে গরম হয়ে উঠবে রোদের তাপে। তবে বন্যা বা ঘুর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে (মেদিনীপুরের ও উত্তরবঙ্গের নিচু এলাকা ও দক্ষিণ বাংলার উপকূল অঞ্চল) এত কাছে বড় গাছ না লাগানোই ভাল। সে ক্ষেত্রে পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিমে নীচু ছাদের বারান্দা রাখলেও ঘর ঠাণ্ডা থাকবে। বারান্দার একটা কোণ বাঁশের জাফরী দিয়ে ঘিরে নিলে রান্না, খাওয়া ও পুজো-পাঠ সারা চলে। বারান্দায় উনান জ্বাললে ছাদে অ্যাসবেষ্টস বা অগ্নি-বারণ প্রলেপ (পরে এর প্রযুক্তিগত বিবরণ আছে) দেওয়া খড়ের চাল হওয়া উচিত। অথবা টিন।

উত্তর ভারতে গ্রাম সংস্কারে এক ধরনের সারবন্দী বাড়ী করা হচ্ছে যার সামনে ও পিছনে দুটি উঠান। বাড়ীগুলি পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগানো থাকায় এক দেয়ালে দু বাড়ীরই কাজ চলে। সস্তা পড়ে। ছাদে ব্যবহার করা হচ্ছে ইটের খিলান। পর পর সারি সারি খিলান একে অপরকে ঠেস দিয়ে রাখছে। খিলান ধ্বসে যাবার আশঙ্কা নেই। ইটের খিলান ছাদ বাড়ীকে আরো সস্তা করে তুলছে। উত্তর ভারতের আবহাওয়া শুকনো ও চরম। পশ্চিম-বাংলার জলো আবহাওয়ায় এই ধরনের সারবন্দী বাড়ী (Row House)-এর

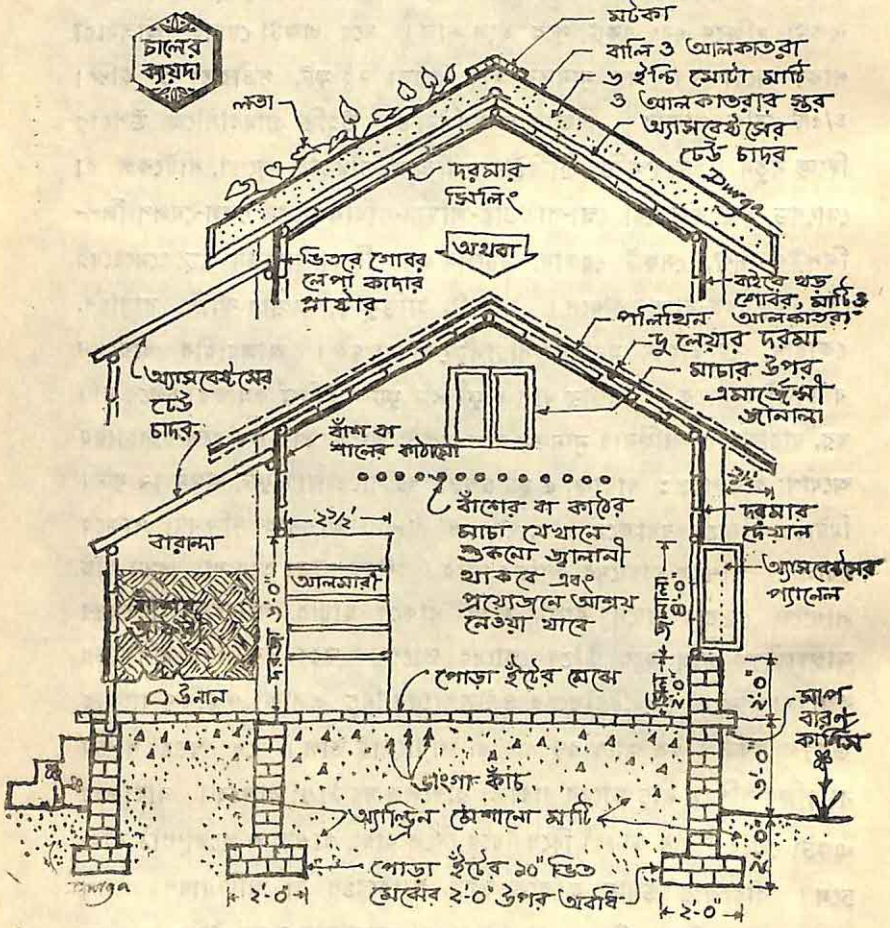

১২নং নকশা—গ্রাম বাস্তুর নির্মাণ শৈলী।

নকশা উপযুক্ত হবে না। তবে পুরুলিয়া প্লেটুর আবহাওয়াও বেশ খানিকটা শুষ্ক ও চরম বলে ওখানে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

দুই ঃ বিকল্প মালমশলা—নকশার পরই শুরু হবে মালমশলা যোগাড়ের পালা। এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলা হয়েছে বিকল্প মালমশলা হিসাবে মাটির কথা। পশ্চিমবঙ্গের চমৎকার এঁটেল মাটিকে এ কাজে লাগানো যায়। দেখা গেছে এই মাটির সঙ্গে ২ শতাংশ সিমেন্ট বা ৪ শতাংশ আলকাতরা

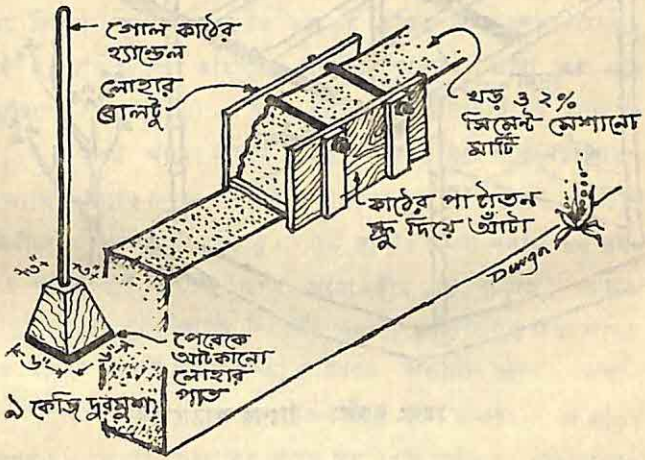

১৩নং নকশা—ছুরমুশ পেটানো মাটির দেয়াল।

মেশালে তার জলরোধক ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সিমেন্ট মিশ্রিত মাটির চেয়ে আলকাতরা মিশ্রিত মাটির খরচ কম, জলরোধক ক্ষমতাও বেশী। এই মিশ্রণের সঙ্গে কুচানো খড় অল্প ঝামার টুকরো মেখে সেই মাটি, দু ধারে কাঠের পাটাতন এঁটে ছুরমুশ পিটিয়ে চমৎকার জলশূন্য ও শক্ত দেয়ালে পরিণত করা যায় যা জলরোধক হিসাবে সাধারণ মাটির দেয়ালের থেকে অনেক উন্নত (১৩নং নকশা)।

মাটির পরই আর একটি সহজ প্রাপ্য ও বহুল সম্ভাবনাময় স্থানীয় উপকরণ হল বাঁশ। তৃণ জাতীয় এই উদ্ভিদের নানান জাত হয়। কোনটা মোটা, ফাঁপা; কোনটা সরু, কমবেশী ভরাট। 'মূলী' বা 'তরজা' বাঁশে বেড়া, 'ভালকো' বাঁশে (মোটা ফাঁপা ঝাড়ালো) ঘরের দেয়াল, পার্টিসানের ছ্যাচাবেড়া তৈরী করা যায়। ঘরের খুঁটি করতে লাগে ভরাট 'জাওয়া' বাঁশ।

আঙ্গিনার বেড়া, তোরণ ; ঘরের খুঁটি, রুয়া, আঁটন, হাঁটন (১৪নং নকশা) ; দোতলা মাটকোঠার মেঝে, মই ; পার্টিশানের চ্যাটাই বা দরমা—ঘর বাঁধতে

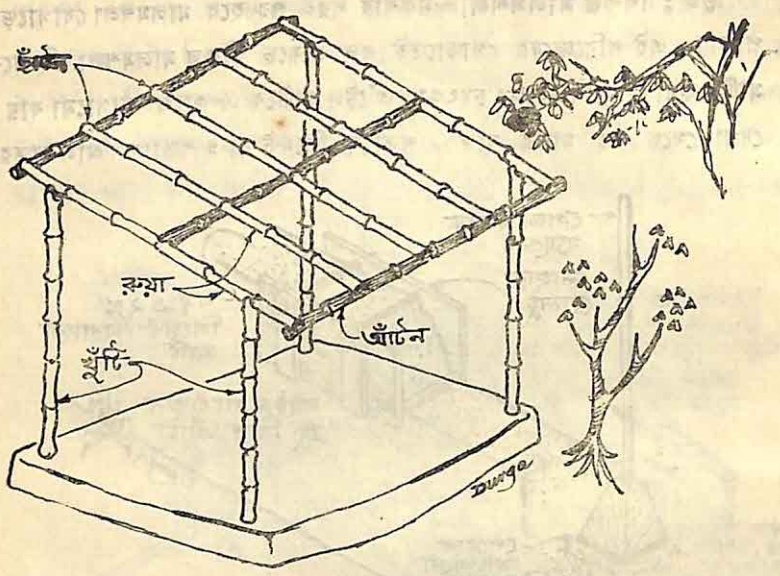

১৪সং নকশা—বাঁশের কাঠামো।

বাঁশের ব্যবহার অগুনতি। মাটির মত বাঁশেরও একটা দোষ আছে, যা সহজেই শুধরে নেওয়া যায়। বাঁশ, বিশেষ করে কাঁচা অবস্থায় কাটা বাঁশ চট করে ঘুণ ধরে অকেজো হয়ে যায়। ঘরে বা ছাদের ফ্রেমে বাঁশ ব্যবহার করলে, তার আয়ু ৫/৬ বছরের বেশী হয় না। এ দোষ শোধরাতে ঝাড় থেকে বেছে পাকা বাঁশ কেটে তাকে সাতদিন ছায়ায় বা বাঁশ বনের ভিতরে ফেলে রেখে, শুকিয়ে নিয়ে, নারকোল দড়ি দিয়ে আঁটি বেঁধে, পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে দু তিন মাস। এর নাম 'প্যানেট' করা বা সিজনীং। এ বাঁশে ঘুণ ধরবে না। আয়ু বেড়ে ১৬।১৭ বছর তো হবেই। এই বিকল্প উপাদানের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি মিশিয়ে কিভাবে বাঁশের প্লাষ্টার করা দেয়াল এবং ঢালাই ছাদ করা যায় তা পরে বিবৃত হয়েছে।

বাঁশের পরেই উল্লেখযোগ্য ধানের কুড়ো থেকে উৎপন্ন বিকল্প সিমেণ্ট। চালকলগুলি যে কুড়োর ছাই ফেলে দেয় তা থেকে বছরে পঁচিশ লক্ষ টন বিকল্প সিমেণ্ট তৈরী হতে পারে এবং এ প্রযুক্তি গ্রামেও গড়ে তোলা

যায়। কুড়ো বা তুষের ছাই-এর সঙ্গে চূণ মিশিয়ে তাকে খুব মিহিন করে পিষে নিতে হবে। যে সিমেন্ট পাওয়া যাবে তা দিয়ে 'কিউব' পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিনদিনে চাপ শক্তি (Compressive Streagth) দাঁড়ায় বর্গসেন্টিমিটারে ১৬০ কেজি এবং ৭ দিনে সে শক্তি বেড়ে হয় ২০০ কেজি। প্রায় পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টেরই সমান। মোলায়েম বলে এ সিমেন্ট দিয়ে গাঁথনী, প্লাষ্টার তো চমৎকার হয়ই, ঢালাইএর কাজও সম্ভব। জোড়হাটের আঞ্চলিক গবেষণাগার একরকম সস্তা জল নিরোধক বোর্ড তৈরী করেছেন তুষ দিয়ে। তুষের সিমেন্টের মত চূণ ভিত্তিক এক মশলা তৈরীর প্রযুক্তি খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনও সরবরাহ করেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'লিমপো' (Lympo)। তবে লিমপো দিয়ে ঢালাইয়ের অনুমতি তাঁরা দেন না। এ রকম আরো নানান বিকল্প উপাদান নিয়ে গবেষণা চলছে। যেমন ফ্লাই অ্যাস ও স্ল্যাগ থেকে তৈরী ইট, মানুষের চুল দিয়ে তৈরী কংক্রীট বোর্ড, গৃহ নির্মাণে কেওলিনের ব্যবহার। এই স্থানীয় বিকল্প সন্ধান শুধু জন-বিস্ফোরণ নয় আরো দুটি কারণে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। গ্রামে কয়লায় পোড়ানো ইট, পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট, নমনীয় লোহার ছড় এবং পাথর কুচি ব্যবহার মানেই বিদেশী মুদ্রায় কেনা পরিবহন জ্বালানীর শ্রাদ্ধ। ফলং-নির্মাণের খরচ গ্রামীণ অর্থ নৈতিক সাধ্যের বাইরে চলে যাওয়া। এ ছাড়া ট্রাক পরিবহণের মত পথঘাট আমাদের গ্রামে খুব বেশী নেইও। উপাদানের নির্বাচন অবশ্য নির্ভর করবে ৪টি বিষয়ের উপর।

(১) কোন মাল কোথায় সহজলভ্য : কোথায় টালি সস্তা, কোথায় উলুখড় বা মূলীবাঁশ মেলে, কোথায় এঁটেল মাটি পাওয়া দুষ্কর, তার উপর নির্ভর করে উপকরণের নির্বাচন।

(২) স্থানীয় মানুষের রুচি, প্রচলিত নির্মাণ-শৈলী, মিস্ত্রি ও ঘরামিদের দক্ষতা।

(৩) স্থানীয় জলবায়ু, বন্যা ও ভূমিকম্পের সম্ভাবনা।

তিন : একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা—উন্নত মানের গ্রামীণ কুটিরের ক্রমিক প্রযুক্তি : আলোচনার প্রথম পর্যায়

আঙ্গিনার সবচেয়ে উচু জায়গা বেছে নিয়ে ঘরটি গড়তে হবে ১১ ও ১২ নং নকশায় দেখানো রীতি অনুযায়ী। এ ঘর বন্যা ও ভূমিকম্পে আশ্রয় যোগাবে

গৃহস্বামীকে। কাজেই মেঝে করতে হবে বানের জল যতটা উঁচুতে উঠতে পারে তার থেকে ৩ ইঞ্চি (৭৫ মি. মি) উঁচু। ৩ ফুট উঁচু ভিতে প্রায়শই কাজ চলে যাবে। মেঝে হবে পোড়া ইট বিছিয়ে, যাতে বানের জলে গলে না যায়। ভিত হবে পোড়া মাটির ইট গেঁথে সম্ভব হলে সিমেণ্ট বালি দিয়ে। ভিতের দেয়াল মেঝের উপর ১ ফুট (২ ফুট করতে পারলে ভাল) পোড়া ইটেই ১০ ইঞ্চি চওড়া করে গাঁথতে পারলে জলরোধক ক্ষমতা বাড়বে।

১৫নং নকশা

এর উপর দুরমুশ পেটানো আলকাতরা মেশানো মাটির বা ৫ ইঞ্চি চওড়া সিমেণ্টের গাঁথনী অথবা সিমেণ্ট বালির পলেস্তারা করা দরমার দেয়াল (১২ নং নকশা) করা যায়। ভূমিকম্পের অঞ্চলে দরমাই সবচেয়ে উপযোগী। চার কোণের পিলার (১১নং নকশা) ঘরটাকে মজবুত করবে। বন্যায় ঘর ছেড়ে যেতে হলে, ঘরের মুখোমুখি দরজা দুটি হাট করে খুলে রেখে যাওয়া উচিত যাতে জলের ঢেউ বাধা না পায়। এরকম একটা ঘরের মাথায়

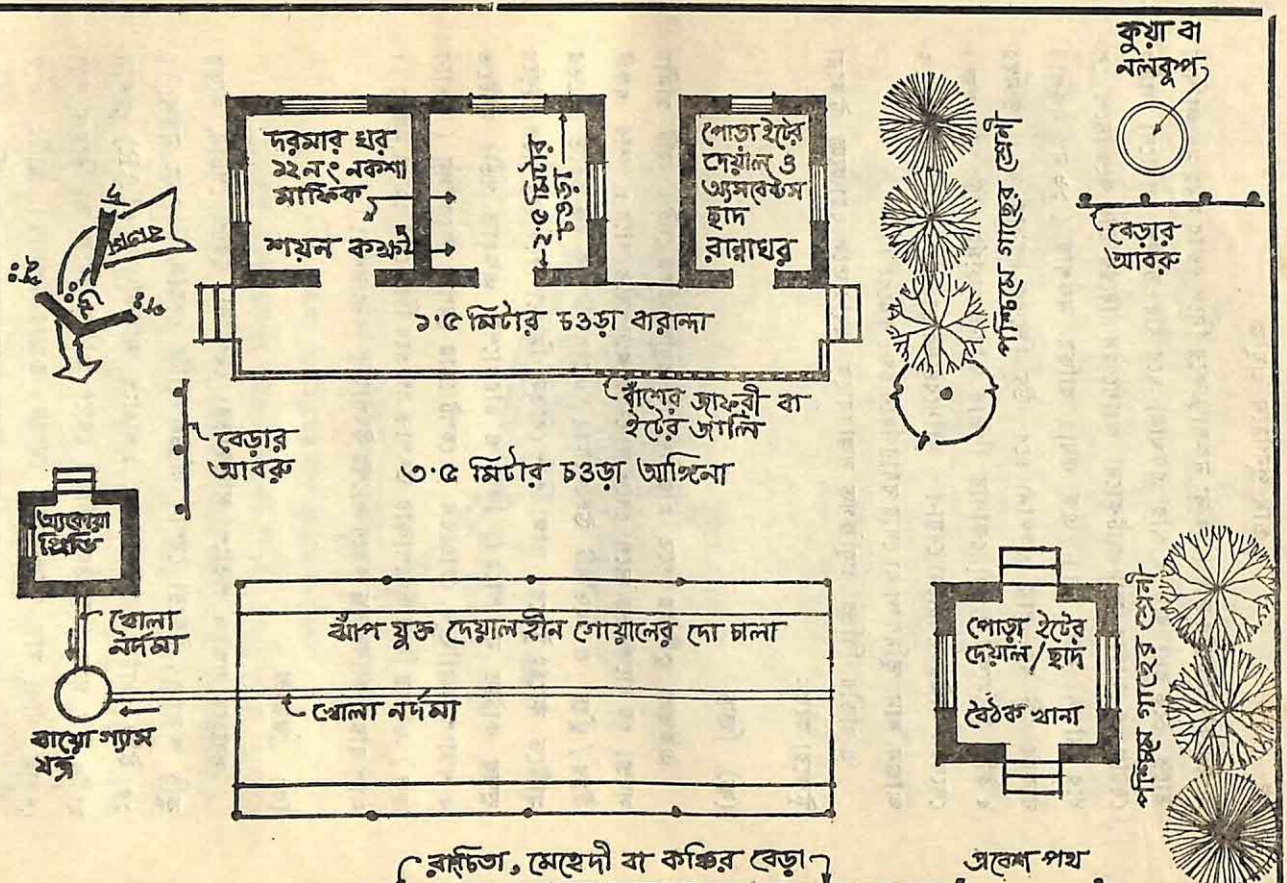

১৬নং নকশা—উন্নত কুটির।

রি-ইনফোর্সড ইটের ছাদ (১৫ নং নকশা) করে নিলে বন্যার সময় মই লাগিয়ে তাতে চড়ে বসা যায়। আর একখানা ঘরে যদি দুরমুশ পেটানো মাটির দেয়াল ও লোহার ফ্রেমে আটকানো অ্যাসবেষ্টস চাদরের ছাদ করে নিলে সে ঘরে আগুন ধরবে না। এক কথায় বাড়ির নকশায় (১৬ নং নকশা) থাকবে ৩টি ঘর—যার একখানা হবে—উঁচু ভিতের দরমার ঘর। দু-নম্বর ৫ ইঞ্চি সিমেন্টের গাঁথনী, কোণায় পিলার ও রি-ইনফোর্সড ইটের ছাদ যুক্ত। শেষেরটি মাটির পেটানো দেয়াল ও অ্যাসবেষ্টসের ছাদ। এ বাড়ী গৃহস্বামীকে আগুন, বান, ভূমিকম্প বা ঘোর বর্ষার দিনে রক্ষা করবেই।

এ বাড়ীর বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাকে এবার তুলে ধরা হচ্ছে টুকরো টুকরো করে :

(ক) ভিত

একতলা কুটিরের ভিতে ইঞ্জিনিয়ারীং প্রযুক্তি কিছু নেই। দুটি স্থানীয় সমস্যা হয় যাতে ভিত ধ্বসে যেতে বা মেঝে বসে যেতে পারে। তার একটি ইঁদুর / ছুঁচো ও দ্বিতীয়টি উইপোকা। এদের উপদ্রব বন্ধ করতে ভিতের মাটিতে কাঁচের টুকরো, ভাঙ্গা শিশি বোতল মিশিয়ে দিতে হবে যাতে ইঁদুরে সুড়ঙ্গ কাটতে না পারে। ভিত ও চারপাশের একহাত গভীর মাটিতে ৫ শতাংশ অ্যাল্ড্রিন, ক্লোরডেন বা হেপটাক্লোর মেশান কেরোসিন (অভাবে জল) ছড়িয়ে দিলে উইপোকার উৎপাত বন্ধ হবে চিরতরে (১২ নং নকশা)। সাপ বারগ কার্নিস বন্ধ করবে সাপের উৎপাত (১২নং নকশা)।

(খ) দেয়াল

সবচেয়ে সস্তা ৪ শতাংশ আল্‌কাতরা মেশানো, দুরমুশ পেটান, খড়ের কুচি ও ঝামার টুকরো মেশান এঁটেল মাটির দেয়াল (১৩ নং নকশা)। ১৫ ইঞ্চি মোটা হবে এ দেয়াল ১ শতাংশ আলকাতরা (TAR) মেশান মাটির ইট গড়ে (কাঠের ফর্মায়) রোদে শুকিয়ে নিলে তা দিয়েও সস্তা দেয়াল গাঁথা যায় আলকাতরা মেশান কাদার মশলায়। মাটির সঙ্গে আলকাতরা মেশাবার সবচেয়ে সহজ উপায় আলকাতরাকে কেরোসিনে গুলে পাতলা করে নেওয়া। তবে তা ব্যয়বহুল। গরম তরল আলকাতরা অল্প মাটিতে মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে বাকি মাটিতে মেশান চলে। একে বলে

প্রিমিক্স (Premix) পদ্ধতি। মশলার মাটিতে কিছু তুষ মিশিয়ে নিলে ফাটবার সম্ভাবনা থাকে না। ইট তৈরীর মাটি হবে ৪ ভাগ এঁটেল মাটির সাথে এক ভাগ বেলেমাটি মিশিয়ে (বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের কাঁকর মাটি এ ধরনের কাঁচা ইটের উপযুক্ত নয়)। এই দুরকম মাটির দেয়ালে তিন দফা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে :

(১) বাইরের দিকে দেয়ালে খাঁজ বা ধাপ থাকলে চলবে না। বাড়ীর কোণগুলি গোল গোল (Rounded) করে দিতে হবে।

(২) ভিত ও প্লিন্থ পোড়া ইটে গাঁথতে পারলে ভাল। না হলে প্লিন্থের বাইরের দিকটা মাটি ঢেকে ঢাল করে দিতে হবে।

(৩) দোচালার চেয়ে চারচালা ঘর বেশী বাঞ্ছনীয়। না হলে পাশের দেয়ালের ত্রিকোণ গেব্‌ল্ এণ্ড বর্ষায় সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

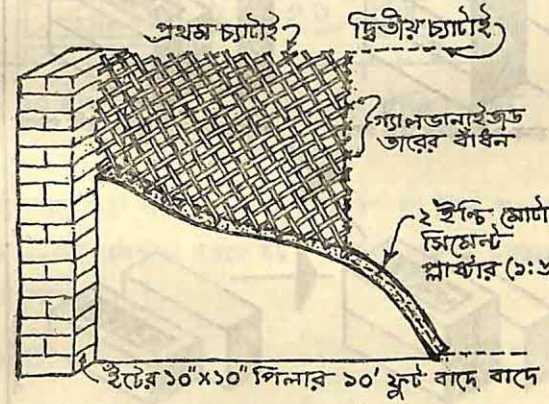

১৭নং নকশা—চ্যাটায়ের লাদ প্লাষ্টার দেয়াল।

প্যানেট করা 'ভালকো' বা 'জাওয়া' বাঁশের বাঁকারী দিয়ে বোনা চ্যাটাই বা দরমা এবং 'মুলী' বা 'তরজা' বাঁশের বেড়া পাশাপাশি গ্যালভানাইজড তার দিয়া বাঁশের ফ্রেমের সঙ্গে বেঁধে দুপাশ থেকে সিমেণ্ট বালির মশলা সজোরে ছুড়ে মারলে চ্যাটাইয়ের ফাঁক দিয়ে সিমেণ্ট জুড়ে গিয়ে দু-ইঞ্চি মোটা চমৎকার পার্টিশান দেয়াল তৈরী হবে যাকে বলে লাদ প্লাষ্টার দেয়াল (১৭ নং নকশা)। মশলার ভাগ হবে ৬ ভাগ বালি ও ১ ভাগ সিমেণ্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে এ ধরনের বহু দেয়াল তৈরী হয়েছিল যা আজও অটুট আছে। দুপিঠের প্লাষ্টার মসৃণ করে চুনকাম করে

দিলে ইটের দেয়ালের মতই দেখতে হবে। টানা দেয়াল হলে ৮/১০ ফুট বাদ বাদ ১০ ইঞ্চি × ১০ ইঞ্চি ইটের পিলারের করে দিতে হবে মজবুতির জন্য। এ দেয়াল হালকা, মেঝের উপরই দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিত লাগবে না। আধলা ভরাট বাঁশ পাশাপাশি মাটিতে পুঁতে বা আড়াআড়ি কাঠের ফ্রেমে আটকে (৫ নং চিত্র) বাঁশের দেয়াল করা যায়। প্লাষ্টার করে দিলে তা আরো মজবুত হবে।

চলতি ইট দিয়ে দশ ইঞ্চির পরিবর্তে আট ইঞ্চি মোটা দেয়াল গাঁথার এক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে দেয়াল হালকা অথচ সমান মজবুত

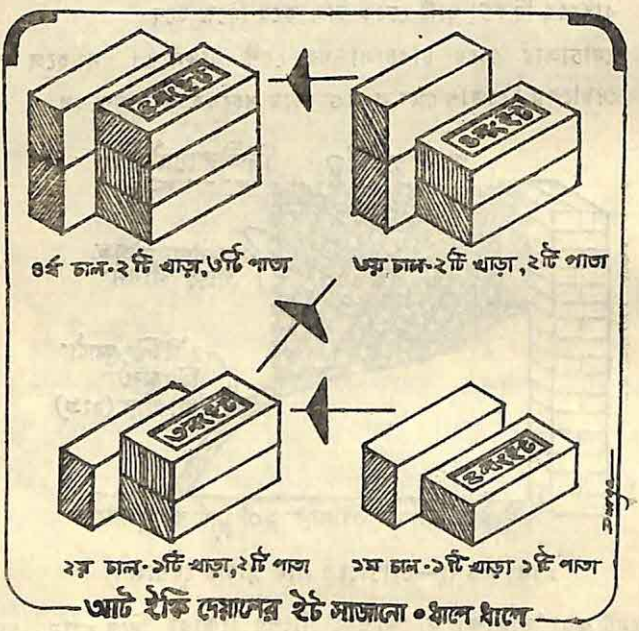

১৮নং নকশা

হয়, সস্তা অথচ বেশী স্থান সঙ্কুলান করে (১৮ নং ও ১৯ নং নকশা)। মশলাও কম লাগে। ১৮ নং ছবিতে দেখুন কিভাবে ৪টি চালে একদিকে পরপর তিনটি পাতা ইট ও অন্যদিকে দুটি খাড়া ইট বসানো হল। এবার ৫" রদ্দা ও ৩" রদ্দা স্থান পরিবর্তত করল। যেদিকে ৫" ইঞ্চি পাতা ইট গাঁথা হচ্ছিল, এবার সেদিকে ৩" খাড়া ইট গাঁথা হবে। এই নতুন ধরনের গাঁথনীতে ২০% ইট কম লাগবে। ১০ ইঞ্চিতে যেটুকু গাঁথতে ৬ খানা ইট লাগে, ৮ ইঞ্চিতে

সেটুকু গাঁথতে লাগবে ৫ খানা ইট (১৯ নং নকশা)। ঘরের মাপ লম্বায় চওড়ায় ৪ ইঞ্চি করে বেড়ে যাবে। দুদিকেই সমান গভীরতার ১২ মি. মি.

১৯নং নকশা

মশলার পলেস্তারা করা যাবে। ১০ ইঞ্চিতে ভিতরের দিকে অসমান গভীরতার ১৯ মি. মি. মোটা পলেস্তারা করতে হয়। দেয়াল হালকা হওয়ায় বুনিয়াদ বা ভিতেও সাশ্রয় সম্ভব।

(গ) প্লাষ্টার

মাটির দেয়ালের মত কাদার পলেস্তারাকেও জল রোধক করা যায় সিমেণ্ট বা আলকাতরা মিশিয়ে। ভিতরে কাদা মাটির প্লাষ্টার করে গোবর লেপে দিলেই যথেষ্ট। চুনকাম করে দিলে ঘরের শোভা ও আলো দুই বাড়বে। বাইরের পলেস্তারা হতে পারে তিন রকম—(১) ৭ ভাগ বা ৮ ভাগ চিকন বালি (Silver Sand) ও ১ ভাগ সিমেণ্ট জল মেখে; (২) এঁটেল মাটির সঙ্গে ৫ শতাংশ সিমেণ্ট এবং ১ শতাংশ সাবান জল মেখে; (৩) বেলে মাটি বা পলিমাটির সঙ্গে কুচানো খড়, ১০ শতাংশ গোবর ও ১০ শতাংশ আলকাতরা মিশিয়ে (১২ নং নকশা)।

সর্বশেষ প্রণালীটি নতুন প্রযুক্তি। একটু বিশদে যাওয়া যাক। মাটিটা বেশী এঁটেল না হলেই ভাল। প্রতি ঘনফুটে ১৮০০ গ্রাম কুচানো খড় মিশিয়ে,

জল দিয়ে মেখে, কাদা কাদা অবস্থায় সাতদিন পচাতে হবে, মাঝে মধ্যে কোদাল দিয়ে উল্টে পাল্টে দিয়ে। কাদাটা শুকিয়ে এলে যদি ফাট ধরতে দেখা যায়, তা হলে একটু বালি মিশিয়ে দিতে হবে। এবার গরম আলকাতরা (বিটুমেন ৮০/১০০ গ্রেড) তে তার ওজনের বিশ শতাংশ কেরোসিন ও ১ শতাংশ মোম মিশিয়ে বিটুমেন দ্রবণ তৈরী করতে হবে। পচানো কাদা মাটিতে দ্রবণ মেশাতে হবে ঘনফুটে ১৮০০ গ্রাম হিসাবে। মিশ্রণ যত ভাল হবে, প্লাষ্টারের জল রোধক ক্ষমতা তত বাড়বে। মাটি লেপার মত করে দেয়ালের গায়ে দিতে হবে পলেস্তারার প্রাথমিক অস্তর। সেটা শুকালে গোবর মাটি দিয়ে লেপতে হবে। এই গোবর মাটিতেও আগের বিটুমেন-দ্রবণ-মিশ্রিত কাদা মেশাতে হবে। এক ভাগ কুচো বিচালী মেশানো কাদাতে একভাগ গোবর ও ঘনফুট প্রতি ১৮০০ গ্রাম বিটুমেন দ্রবণ মিশিয়ে লেপার উপযুক্ত পাতলা করে নিতে হবে জল দিয়ে। প্লাষ্টার শুকিয়ে গেলে চুনকাম করা যাবে।

মাটির দেয়ালকে বর্ষার হাত থেকে রক্ষা করার আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে বিটুমেন দ্রবণ স্প্রে করা। ৮০/১০০ গ্রেডের ৫ কেজি বিটুমেন গরম করে দশ লিটার কেরোসিনে গুলতে হবে। এবার দ্রবণটাকে ছেঁকে নিয়ে কীটনাশক স্প্রে মেশিনের সাহায্যে দেয়ালে ভাল করে ছিটিয়ে দিন। প্রথম দফায় উপর থেকে নীচে ও দ্বিতীয় দফায় পাশাপাশি। দু দফার মাঝে শুকাবার সময় দিতে হবে ৪ ঘণ্টা। কাজটা করা উচিত কড়া রোদে। স্প্রের প্রলেপ সর্বত্র সমান হতে হবে। প্রলেপ দেবার আগে দেয়ালের ফুটো ফাটা সব মেরামত করে নিতে হবে গোবর মেশানো কাদা দিয়ে। স্প্রে করার পর দেয়ালটা গাঢ় ছাই রংএর হয়ে যাবে। চুনকাম করে নিলে ফিরে আসবে পূর্বশ্রী।

(ঘ) দরজা-জানলা

সহজলভ্য স্থানীয়—কাঁঠাল, জাম, পিয়াসাল, শাল, শিশু, জারুল, শিরীষ, অর্জুন, লোহাকাঠ ও বাবলা জাতীয় কাঠ গৃহনির্মাণ শিল্পে ব্যবহার করা চলে। ফ্রেম তিন কাঠের হওয়া উচিত (২০ নং নকশা)। জানলার বেলা তলাঞ্চি (ফ্রেমের চতুর্থ অংশ) ইট গেঁথে বা ঢালাই করে করলে টেঁকে বেশীদিন। উপরের কাঠে দুদিকে ৬ ইঞ্চি লম্বা শিং বা কান বেরিয়ে থাকবে, যা দেয়ালে ঢুকে ফ্রেমকে আটকে রাখবে। নীচের খাড়া দুটি কাঠও মেঝেতে ৬" ইঞ্চি

ঢুকিয়ে দিতে হবে একই উদ্দেশ্যে। এইভাবে লোহার ক্ল্যাম্প ব্যবহার এড়ানো যায়। ফ্রেম বসাবার আগে আলকাতরা মাখিয়ে নিতে হবে। যে অংশগুলি

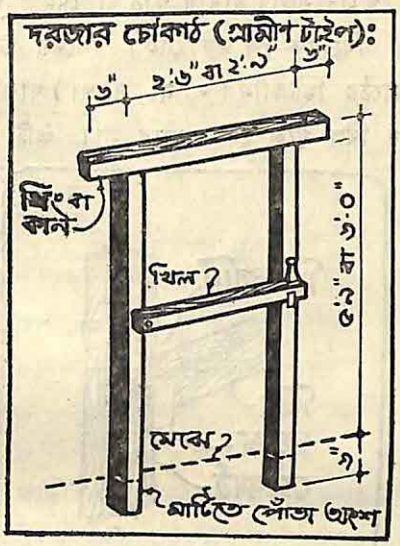

২০নং নকশা

দেয়াল বা মেঝেতে ঢুকবে সেগুলি আলকাতরা মাখাবার আগে আগুনে ঝলসে নিলে উইপোকার উপদ্রব আরো কমে যাবে।

পাল্লার প্যানেলে কাঠের তক্তার চেয়ে অ্যাসবেষ্টসের সিট আটকানো সস্তা ও বেশী টেকসই। আরো সস্তা করতে হলে কেরোসিনের টিন বা পিচের ড্রাম কেটে লাগানো যায়। দরজার মাপ অনেক সময় অনর্থক বাড়ানো হয়। খাড়াইএ ৫'৯" থেকে ৬'০" ও চওড়ায় ২'৬" থেকে ২'৯" যথেষ্ট। সেই তুলনায় জানলা-গুলি হয় বড্ড ছোট ও উচুতে বসান। এগুলির ন্যূনতম মাপ ৪'-০"×২'-৬" হওয়া দরকার। মেঝে থেকে ২ ফুট উঁচুতে বসালে ঘরের মধ্যে হাওয়া চলাচল করে যথাযথ ভাবে (১২ নং নকশা)। ঝাঁপ জানলা (যার মাথার দিকটা চৌকাঠের সঙ্গে কব্জায় বাঁধা থাকে) একই সঙ্গে ঘরে হাওয়া ঢোকায় আবার রোদ-জল-ঝড় থেকে ঘরকে বাঁচায় জানলার সামনে কারনিশের মত ছাতা ধরে। ঝাঁপ জানলার কারিগরী সরল। বাড়ীওয়ালা নিজেই করে নিতে পারেন। টাকা পয়সার বেশী টান থাকলে প্যানেট করা জাওয়া বাঁশের চৌকাঠ করা যায়।

দরজা আটকানোর জন্য লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের ছিটকানির চেয়ে খিল বা হুড়কো (২০ নং নকশা) গ্রামীণ প্রযুক্তির পক্ষে বেশী উপযুক্ত। কারণ কাঠ সামান্য বেঁকে গেলে—সস্তার স্থানীয় কাঠ বাঁকবেই—ছিটকানি লাগানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। খিলেতে সে ভয় নেই। খিলের উপর ফ্রেমের সঙ্গে লাগানো একটি কাঠের ছিটকানি (২১ নং নকশা) থাকলে বাইরে থেকে খুন্তি বা ছুরি দিয়ে খিল খুলে ফেলা যাবে না। এটি একটি সস্তা অথচ

২১নং নকশা

চমৎকার কার্যকরী গ্রামীণ প্রযুক্তি। কাঠ দামী জিনিষ। টেঁকসই করতে পচন ও পোকার হাত থেকে অবশ্যই রক্ষা করা দরকার। এ ব্যাপারে কাঠে গরম ক্রিয়োজোট তেল মাখানো খুবই কার্যকরী। এ তেল না পেলে কাঠ আগুনে ঝলসে আলকাতরা মাখানোও সমান উপযোগী। আলকাতরার অভাব হলে তুঁতের জল মাখিয়ে সে অভাব পুরণ করা যায় খানিকটা।

(ঙ) ছাদ

আমরা তিন রকম ছাদের প্রযুক্তিগত আলোচনা এখানে করব। এক, সবচেয়ে সস্তা ও স্বল্পস্থায়ী বিচালীর ছাউনী; দুই, উভয়তঃ মাঝামাঝি অ্যাসবেষ্টস ছাদ এবং তিন, আপেক্ষিক ভাবে ব্যয়সাধ্য ও দীর্ঘস্থায়ী ইটের ছাদ। পোড়া মাটির টালি (হুরিয়া / খাপরা খোলা ও রাণীগঞ্জ টালি) এবং পাথরকুচি মিশ্রিত সিমেন্টের ঢালাই ছাদ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি

কারণ টালির চাল গ্রামাঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত হলেও এর অনেকগুলি ত্রুটি রয়েছে যা একে নবীনতর প্রযুক্তির অন্তর্গত করার বাধা স্বরূপ :

(১) টালির চাল ভারী ও নড়বড়ে। বন্যা, ঝড় ও ভূমিকম্পে খুব বেশীক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না। ভঙ্গুর, সামান্য শিলাবৃষ্টিতেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(২) বড় ঘরের পক্ষে অনুপযুক্ত। কারণ সেক্ষেত্রে শক্তিশালী কাঠের কাঠামো দরকার হয় যা খুবই ব্যয়বহুল। হালকা ফ্রেম বা বাঁশ দিয়ে ছাউনী করলে টালির ভারে সে ফ্রেম বেঁকে যায় ও টালির জোড় খুলে ঘরে জল পড়ে।

(৩) টালি পোড়াতে ভাটা, কয়লা ইত্যাদির হাঙ্গামাও কম নয়। অনেক সময় টালি প্রস্তুতের ক্ষেত্র কৃষিজমি কব্জা করে নেয়। এটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। ভারী ভারী টালির পরিবহনও ব্যয়সাধ্য।

(৪) টালির জোড়াই করতে হয় পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট দিয়ে যা নীতিগত ভাবে গ্রামীণ প্রযুক্তির পরিপন্থী।

আর. সি. সি. বা লোহা-পাথরকুচি যোগে সিমেণ্টের ঢালাইয়ের ব্যয়-বহুলতা এবং গ্রামদেশে এর কাঁচা মালের অভাব একে গ্রামীণ প্রযুক্তি থেকে দূরে রেখেছে।

খড়ের চাল বাংলাদেশের নিজস্ব বস্তু। ঘরামিরা বংশ পরম্পরায় এ কাজে দক্ষতা অর্জন করেছে। খড়ের চাল সস্তা, হালকা ও ঘরকে চমৎকার ঠাণ্ডা রাখে। স্থানীয় বাঁশ দিয়ে ছাউনীর কাঠামো করা যায়। এর দোষ স্বল্পস্থায়ী জীবন ও আগুনের বিরুদ্ধে অসহায়তা। বিচালীতে আলকাতরা আর গোবর মিশিয়ে লেপে দিলে চাল অগ্নিরোধক হয়ে উঠবে; আয়ু বাড়বে ১৫/১৬ বছর—খড় পচে জল পড়বে না ঘরে। কাঠামোর বাঁশকে ১ থেকে ২ শতাংশ কপার সালফেট সলিউসানে ডুবিয়ে নিলে তার আয়ুও বেড়ে যাবে ৪০ শতাংশ। এই সলিউসান বিচালীতেও লাগানো যায়। ঘুণ, উইয়ের বিরুদ্ধেও কাজ করে চমৎকার। ১০০ ভাগ জলে গুলে নিতে হবে নীচের ওষুধগুলি :

কপার সালফেট—২ ভাগ

অ্যামোনিয়া ফসফেট—৩ ভাগ

বোরিক অ্যাসিড—৩ ভাগ
জিঙ্ক ক্লোরাইড—৫ ভাগ
সোডিয়াম ডাইক্রোমেট—৩ ভাগ

এই ভাবে এই কৃষি আবর্জনাকে এক চমৎকার আচ্ছাদনের উপাদানে পরিণত করা যায়, যা ঝড়, জল, বন্যা বা ভূমিকম্পে আদর্শ উপাদান হিসাবে আগে ভাগেই স্বীকৃত। বাঁশকে 'প্যানেট' করার প্রযুক্তি তো আগেই বলা হয়েছে।

এরপর অ্যাসবেষ্টস চাদর। টেঁকসই তবে খরচ বেশী। এ খরচ আয়ত্বের বাইরে হলে আছে নবাবিষ্কৃত সস্তাতর বিকল্প অ্যাসফাল্টিক রুফিং সিট (প্রায় অ্যাসবেষ্টসের মতই টেঁকসই) কিম্বা আলকাতরার পিপে কাটা টিন। এ টিনে আলকাতরা মাখানো থাকে বলে খুব টেঁকসই হয়। এ ছাড়া আছে এক রকম বেঁকানো অ্যাসবেষ্টসের চাদর যা দিয়ে গোলাকার ছাদ করা চলে বিনা কাঠামোতেই শ্রেফ নাটবলটু এঁটে (৬নং চিত্র)। কাঠামো না থাকায় সস্তা তো বটেই, তৈরীও করা যায় কম শ্রমে; তড়িৎ গতিতে। বাঁশের কাঠামোয় দু পরত দরমার মাঝে ত্রিপল বা পলিথিন সিট আটকে নিলে জল-নিরোধক ছাদ করা যায়। আলকাতরা গোবর লেপে দিলে অগ্নি নিরোধকও হবে। তবে উপর দিকটা সিমেণ্ট পলেস্তারা না করে নিলে টেঁকসই হবে না। ঢালু চালে ৬" (১৫০ মি. মি.) পুরু আলকাতরা মিশ্রিত মাটি (৪ : ১০০) চাপিয়ে তার উপর ৬ মি. মি. মোটা বালি মেশানো আলকাতরা লেপে দিলে ঘর ঠাণ্ডা থাকবে, জল পড়বে না, চালে আগুন লাগার ভয় থাকবে না (১২নং নকশা)। ছাদের কানা দেয়াল থেকে দেড় ফুট (½ মিটার) বার করে দিলে দেয়ালের আয় বেড়ে যাবে বেশ খানিকটা (১২নং নকশা)।

সবশেষে ইটের ছাদ। দুরকম হয়—ইটের ভল্ট বা অর্ধগোলাকার ছাদ। উত্তর ভারতে এর বহুল চল। পশ্চিমবাংলার শুকনো অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো যায়। তবে ধনুকাকৃতি এই ছাদের পার্শ্বচাপ (Lateral Thrust) সামলাতে কুটিরগুলি 'কমন' দেয়ালে পাশাপাশি সারিবদ্ধ হওয়া দরকার। এ রকম ঘেঁষাঘেঁষি প্ল্যানিং পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র আবহাওয়ায় খুব আরামদায়ক হবে না। ছাদে লোহার ব্যবহার নেই, সিমেণ্টও লাগে খুব অল্প। কাজেই সস্তা হতে বাধ্য। ইটের আর এক রকম আলোচ্য ছাদ হচ্ছে আর. বি. সি. (Reinforced Brick Concrete) যার প্রযুক্তিগত দিকটা তুলে ধরা হয়েছে ১৫নং নকশায় এবং উন্নত গ্রামীণ কুটিরের আলোচনার প্রথম প্যারাতেই।

এ ছাদ ঢালাই ছাদের মতই টেঁকসই ও শক্তিসম্পন্ন। এর একমাত্র দোষ এ ছাদে জল বসে এবং ভারী বলে বুনিয়াদও করতে হয় আনুপাতিক ভাবে বেশী চওড়া। বর্ধমান, বীরভুম ও বাঁকুড়াতে এক নিম্নমানের কেওলিন বা চীনামাটি পাওয়া যায় যাতে রয়েছে কমবেশী সিলিকা, অ্যালুমিনা, লৌহ অক্সাইড, চুন, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি খনিজ পদার্থ। এই নিম্নমানের কেওলিন দিয়ে সেরামিকসের কাজ না হলেও এর জোড়ন ধর্ম (Cementing Quality) চমৎকার। আর. বি. সি-র ইটের মাটিতে ১০/১৫ শতাংশ এই কেওলিন মিশিয়ে নিলে তা মজবুত তো হবেই, জল নিরোধক ও হবে। পুরুলিয়া

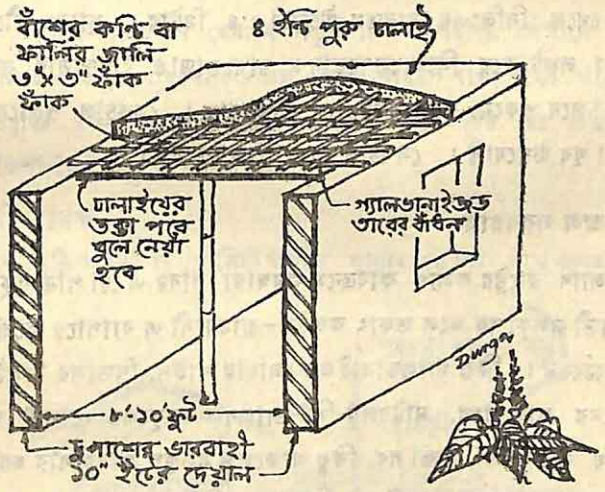

২২নং নকশা

প্লেটুতে স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। রুরকির সি. বি. আর. আই (Central Building Research Institute) মাটির সঙ্গে ফ্লাই অ্যাস (Fly Ash) মিশিয়ে যে ইট তৈরী করেছেন তা তাপ নিরোধক ও সাধারণ ইটের চেয়ে এককেজি মত হালকা। এই দুই প্রযুক্তি মিশিয়ে ছাদের উপযুক্ত হালকা, জল ও তাপ নিরোধক ইট তৈরী সম্ভব।

আর এক রকম ছাদের কথা বলে শেষ করব এই পর্ব। তা হল বাঁশের রি-ইনফোর্সড ঢালাই ছাদ (২২নং নকশা)। লোহার ব্যবহার নেই এক ফোঁটা। বদলী হিসাবে ব্যবহৃত বাঁশের কঞ্চি যার টান শক্তি (Tensile

Strength) লোহার ছড়ের মত না হলেও বেশ বেশী। ৩ মিটার চওড়া একতলা ঘরে এ ছাদ সস্তায় কিস্তি মাত করতে পারে। কংক্রিটের ভাগ হবে ১ : ২ : ৪। ছাদে জল বসে লোহার রি-ইনফোর্সমেণ্টে মরচে ধরে ছাদ ফাটায়। এ ছাদে সে ভয় নেই। কাজেই জলছাদ না করলেও চলবে। খেয়াল রাখবেন বাঁশের জালিটা যেন তক্তার এক ইঞ্চি উপরে থাকে।

(চ) সিলিং

দরমার সিলিং (১২নং নকশা) ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে। খরা এলাকায় সিলিং লাগালে ফল ভাল হবে। সিলিংএ চুনকাম করলে ঘরে আলো বাড়বে। মেঝে থেকে সিলিংএর ন্যূনতম উচ্চতা ২·৪ মিটার। ছাদের নীচে বাঁশের মাচা বা লফট করে নিলে লেপতোষক রাখা ছাড়াও বানভাসীর সময় রেখে যাওয়া চলবে শুকনো কাঠ, ঘুঁটে, নুন ও পশুখাদ্য। সেদ্ধচাল শুকানোর জন্যও এ মাচা খুব উপযোগী। সেদ্ধচাল ছায়ায় শুকাতে হয়।

(ছ) জল সরবরাহ

কল্যাণ রাষ্ট্রের কল্যণ কার্যক্রমে জনস্বাস্থ্য বাবদ এঁদো পানাপুকুরের আর পঞ্চায়েতী নলকূপের জলে তফাৎ কতটা—গ্রামবাসী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু গ্যালভানাইজড লোহার পাইপ, পিতলের ফিলটার, কাষ্ট আয়রনের হাণ্ডপাম্প, নাটবলটু-সিট-ভ্যালব···নলকূপের প্রতিটি অংশ এত দামী যে সচেতনতা, ইচ্ছা সব কিছু থাকলেও নলকূপ গ্রামবাসীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। প্লাষ্টিকের ফিলটার, পলিথিনের পাইপ হয়ত পারে এই দামের ব্যাপারটাকে খানিকটা সামলাতে, কিন্তু তার বহুল প্রচার এখনো হয় নি। তাছাড়া প্লাষ্টিকের টিউবওয়েল বসাতেও ১৭০০/১৮০০৲ টাকা খরচ। ক্ষেতহীন মজুর বা প্রান্তিক চাষীর পক্ষে তাও দুঃসাধ্য। কপার সালফেট সলিউসানে ডোবানো প্যানেট করা ফাঁপা ভালকো বাঁশের সাহায্যে লোহার পাইপের গ্রাম্য পরিবর্ত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই বাঁশের পাইপ দিয়ে নলকূপ বানাবার চেষ্টা পরীক্ষার স্তরে সফল। ব্যবহারিক স্তরে যদি সে সাফল্যকে উঠিয়ে আনতে পারা যায় তা হলে নলকূপের অর্থ নৈতিক দিকটার একটা সুরাহা হতে পারে। এছাড়া নলকূপের পরিবর্ত হিসাবে কংক্রিটের বা পোড়ামাটির চাক বসানো কাঁচা পাতকুয়ার চলন হতে পারে। সরকার সি.

এ. ডি. সি.র (Comprehensine Area Development Corporation) ও কৃষিবিভাগ মারফৎ সেচকূপের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ভরতুকি দিচ্ছেন। এই ভরতুকি ব্যক্তিগত কুয়ার জন্য প্রসারিত করলে গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হবে। কাজটা বিপুল ; একসঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গে করা সম্ভব নয়। তবে খরা ও দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলের ক্ষুদ্রতম কৃষককুলকে নিয়ে কাজ সুরু করা যেতে পারে। এই সব পাতকুয়ার উপরে যেন ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আবশ্যিক করা হয়।

এ. আই. আই. এইচ. (All India Institute of Hygine) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখেছেন বায়ুহীন পরিবেশে কচুরীপানা জল থেকে ভারি ধাতু, ব্যাকটেরিয়া ও নানা ধরণের দুষিত জৈব পদার্থ টেনে নিয়ে জলকে নির্মল করে তোলে। গ্রামীণ পরিবেশে যেখানে কচুরীপানা অপর্যাপ্ত, সেখানে গ্রামীণ জল কার্যালয়ে এ ভাবে পরিশোধিত জল বাঁশের পাইপে বাড়ী বাড়ী পাঠানোর একটি প্রযুক্তি গড়ে উঠতে পারে। এ. আই. আই. এইচ. এর তত্বাবধানে প্লান্টের নকশা তৈরীর কাজ চলছে।

(জ) শূচি-ব্যবস্থা

গ্রামীণ শূচি-ব্যবস্থা বা স্যানিটেশানকে সাধারণের দৃষ্টি পথে প্রথম এনে-

২৩ নং নকশা

ছিলেন মহাত্মাজী, তাঁর সবরমতি আশ্রমে খাটা পায়খানার বদলে কুয়াপায়খানার

আধুনিক বায়ো-গ্যাস প্লান্টে এই জৈবগ্যাস গ্যাসপাইপ মারফৎ চালান করে কাজে লাগানো হয় জ্বালানী হিসাবে। এই গ্যাসে থাকে ৬০-৬৫% মিথেন, ৩০-৩৫% কার্বন ডাই অক্সাইড ও সামান্য নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড। এক ঘন মিটার গ্যাস জালিয়ে যে উত্তাপ পাওয়া যায় তা তল ২০,০০০-২৪,০০০ কেজে। মলের ঘন অংশটুকুকেও মাটি হতে না দিয়ে প্লান্টের ডাইজেষ্টারে তরল নাইট্রোজেন সারে পরিণত করা হয়। নলকূপ পায়খানার গর্তটি ১০ ইঞ্চি মত চওড়া—মাটি কাটা বোরার বা অগার দিয়ে খোঁড়া হয়। প্রতিবার ব্যবহারের পর একটু করে মাটি ফেলতে হয় মলের সঙ্গে। এতে গর্তটি ক্রমে ভরে আসে। ৬/৭ জনের পরিবারে ১৪।১৫ মাস বাদে নলকূপটি ভরে এল পায়খানাটি নতুন জায়গায় সরিয়ে নিতে

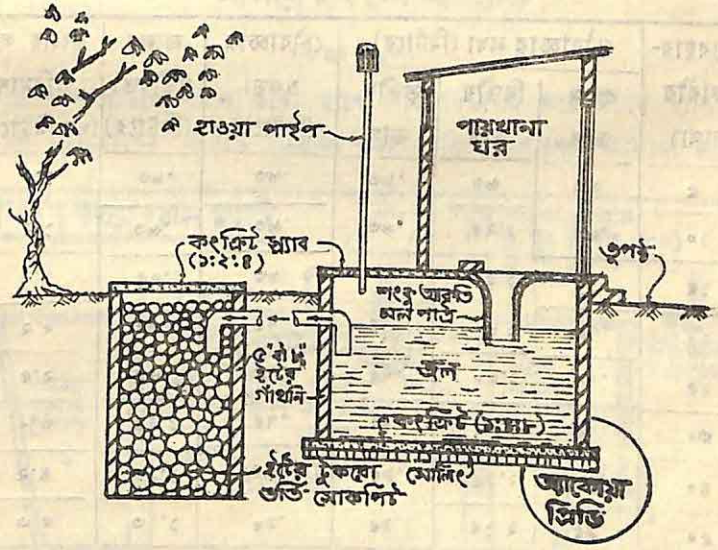

২৫ নং নকশা

হয়। নলকূপের উন্নত সংস্করণ ২৩নং নকশায় দেখানো কুয়া পায়খানা। মলের সঙ্গে মাটি ফেলতে হয় না। শুধু জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই চলে। কুয়ার ব্যাস ২ ফুট থেকে ৩ ফুট। মাঝারী মাপের কুয়া পায়খানা ৫/৬ জনের ছোট পরিবারে ৮ থেকে ১০ বছর ভাল ভাবে কাজ করে। তবে এর প্রাথমিক খরচ নলকূপ-পায়খানার চেয়ে ৪/৫ গুণ বেশী।

অ্যাকোয়া প্রিভিতে (২৫ নং নকশা) প্যান বা মলপাত্রের তলার জলের

প্রচলন করে। এরপর এর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এনে দিয়েছে নলকূপ পায়খানা, অ্যাকোয়া প্রিভি, সেপটিক ট্যাঙ্ক ও শেষ মেশ বায়ো-গ্যাস প্লান্ট। এখানে এইগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। গ্রামবাঙলার শতকরা ৯৫টি বাড়ীতে কোন পায়খানা নেই। কাজটি সারা হয় মাঠে আলের আড়ালে, পুকুর পাড়ে বা বাঁশ বনে। মশা মাছি ও গুয়ে পোকার উৎপাতে সেই খোলা পচা মল থেকে দুষিত হয়ে ওঠে চারদিকের জল-বাতাস-সব কিছু।

সস্তার স্যানিটারী পায়খানা হিসাবে স্বীকৃত কুয়াপায়খানা (২৩নং নকশা) এবং নলকূপ পায়খানা (২৪নং নকশা) বস্তুত একই জিনিষ। প্যান বা মল পাত্র থেকে মলটা জলের সিল মারফৎ একটি কুয়া বা বোর হোলে গিয়ে জমা হয়। সেখানে অন্ধকারে ও তাপে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মলটা ক্রমে মাটি ও

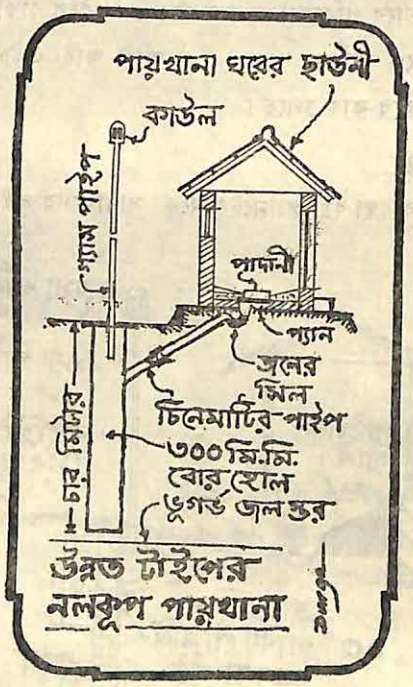

২৪ নং নকশা

জৈব গ্যাসে পরিণত হয়। প্রতি ১০০ জন মানুষের মল থেকে দৈনিক ২·৮৩ ঘনমিটার জৈবগ্যাস বেরুতে পারে। কুয়া বা নলকূপ টাইপ পায়খানায় এই গ্যাসটি হাওয়া পাইপ দিয়ে কাউলের মারফৎ বাতাসে মিশে যায়।

সিলটুকু একটা চৌবাচ্চার আকৃতি নিয়েছে। এই চৌবাচ্চার জলে কঠিন মলের বিভাজন হয় তরলাংশ ও জৈব গ্যাসে। তরলাংশ তীর চিহ্নিত নল দিয়ে চলে যায় সোকপিঠে। গ্যাস উড়ে যায় হাওয়া পাইপ মারফৎ। অ্যাকোয়া প্রিভি সেপটিক ট্যাঙ্কের আদি সংস্করণ যা অধুনা সি. এম. ডি. এ. (Calcutta Metropolitan Development Authority) বৃহত্তর কোলকাতায় ব্যবহার করেছেন খাটা পায়খানার পরিবর্ত হিসাবে। ব্যয় বহুল জিনিষটি গরীব গ্রামবাসীর আয়ত্বে আনতে হলে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার। সেপটিক ট্যাঙ্কে অ্যাকোয়া প্রিভির চৌবাচ্চাটি তিন ভাগ করা হয় যাতে ভিতরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরো ভাল ভাবে চলে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা হিসাবে চৌবাচ্চা তিনটির মাপ কম বেশী হয় :

ব্যবহার-কারীর সংখ্যা	চৌবাচ্চার লম্বা (মিটারে)			চৌবাচ্চার চওড়া (মিটারে)	জলের গভীরতা (মিটারে)	জলের ঘন পরিমাণ (ঘন মিটারে)
	প্রথম ভাগ	দ্বিতীয় ভাগ	তৃতীয় ভাগ			
৫	·৬৩	·৬৩	·৬৩	·৬৩	·৬৩	১·০
১০	·৬৩	১·২৫	·৬৩	·৬৩	·৬৩	১·২
১৫	·৭৫	১·৫০	·৭৫	·৬৩	·৭৫	১·৭
২০	·৭৫	১·৮০	·৭৫	·৭৫	·৭৫	২·২
২৫	·৭৫	১·৮০	·৭৫	·৭৫	·৮৫	২·৫
৩০	·৭৫	১·৮০	·৭৫	·৭৫	১·০৫	৩·০
৪০	·৯৫	২·১৫	·৯৫	·৭৫	১·২৩	৪·২
৫০	·৯৫	২·১৫	·৯৫	·৯৫	১·২৩	৫·৩

১০, ১৫ বা ২০ জনের উপযুক্ত অ্যাসবেষ্টসের তৈরী সস্তা সেপটিক ট্যাঙ্ক পাওয়া যায় নামী অ্যাসবেষ্টস প্রস্তুতকারকদের কাছে। এগুলি (২৬ নং নকশা) গ্রামীণ পরিবেশে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা চলে।

পায়খানার প্রযুক্তিগত উন্নতিতে এপর্যন্ত বায়োগ্যাসের প্রতি কোন নজরই দেওয়া হয় নি। হাওয়া পাইপের মাধ্যমে তা নষ্টই হত। আই. এ. আর. আই. (Indian Agricultural Research Institute), বোম্বাইয়ের শ্রী জে. জে. প্যাটেল, বিখ্যাত গান্ধীবাদী শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এবং কে. ভি.

আই. সি (Khadi & Village Industry Commission) স্বাধীনোত্তর যুগে গবেষণা করে বার করলেন গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট। উদ্দেশ্য ছিল গোবরকে

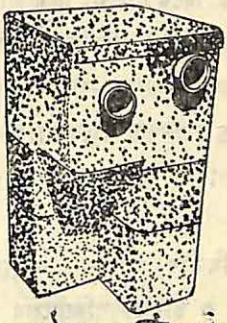

অ্যানেরোবিক সেপ্টিক ট্যাঙ্ক

২৬ নং নকশা

ঘুঁটে রূপে পুড়িয়ে নষ্ট না করে, প্লান্টে তার বিভাজন করে মিথেন গ্যাস ও তরল নাইট্রোজেন সারকে আলাদা করা। মিথেন গ্যাসকে জ্বালানী রূপে

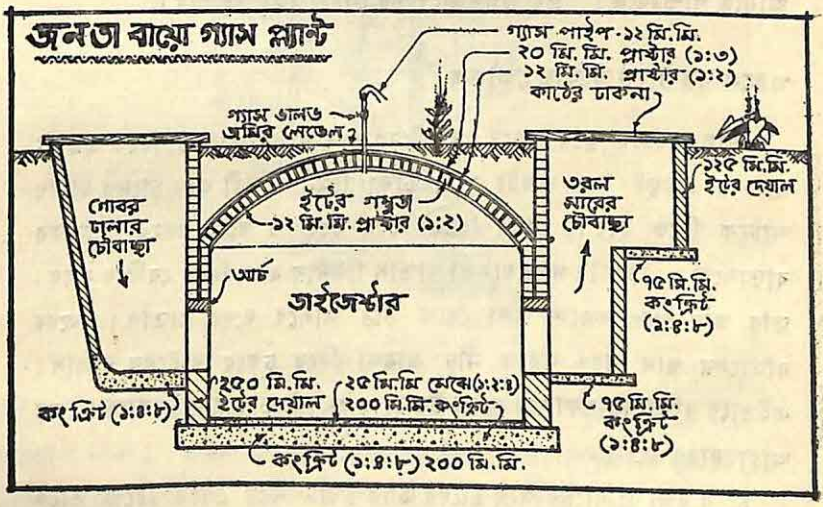

২৭ নং নকশা

ও তরল সারকে কৃষিক্ষেত্রে সার রূপে ব্যবহারে গোবরের পূর্ণাঙ্গ সদব্যবহারই ছিল এ গবেষণার উদ্দেশ্য। কে. ভি. আই. সি.র প্লান্টে যে বৃহদাকৃতি লোহার উপুড় করা ড্রাম বা গ্যাস হোল্ডার দরকার হত গ্রামীণ পরিবেশে তা পাওয়া

দুষ্কর। তাই লক্ষ্ণৌয়ের রাজ্য পরিকল্পনা সংস্থা নক্সা করেছেন জনতা বায়োগ্যাস প্লান্টের (২৭ নং নকশা) যাতে ডোম সমেত পুরো প্লান্টটাই তৈরী হয় সস্তা স্থানীয় উপাদান দিয়ে (৭ নং চিত্র)। এতে শুধু গোবর নয়, সব রকম মল (পশু, পাখী বা মানুষ) ও কৃষি আবর্জনা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা চলে। ১১ নং নকশায় দেখুন পায়খানা ও গোয়ালের নর্দমা সরাসরি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে জনতা বায়োগ্যাস প্লান্টে। এই ভাবে গ্রামের অকল্যাণকর শত্রুস্বরূপ আবর্জনাগুলিকে বদলে নেওয়া যায় পরম কল্যাণকর বন্ধুরূপী উপকরণে।

এবার আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়। এখানে আমরা উন্নতমানের কুটিরকে ঝড়-জল-আগুন-ভূকম্পন ও দূষিত পরিবেশের হাত থেকে আরো দৃঢ়ভাবে বাঁচাতে কি ভাবে আরো উন্নত করে তুলতে পারি, আলোচনা করব তারই প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে। ১৯৮২-৮৩ সালে যোজনা কমিশন গ্রামীণ ভূমিহীন মানুষকে বাড়ী করার জন্য সওয়া কাঠা করে বাস্তুজমি ও ৫০০ টাকা আর্থিক অনুদান বাবদ ৬৫,৮৫,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর একটা সিংহভাগ আসছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রযুক্তিগতভাবে এর ফায়দা ওঠাতেই হবে।

গরমে ঘর ঠাণ্ডা রাখার কৌশল

আলকাতরার ড্রাম কেটে যে টিনের পাত পাওয়া যায় তা দিকে একফুট ব্যাসের চারফুট লম্বা একটা মাথা ঢাকা চিমনী তৈরী করে চালের মাথায় আটকে দিতে হবে। রোদে চিমনী গরম হবে ও গরম করবে ভিতরের বাতাসকে। চিমনীর গরম হালকা বাতাস চিমনীর মাথা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার স্থান পুরণ করতে তলা থেকে উঠে আসবে ঘরের বাতাস। ঘরের বাতাসের স্থান পুরণ করতে নীচু জানলা দিয়ে ঢুকবে বাইরের বাতাস। এইভাবে বাতাসের সঞ্চালনে ঘরের উষ্ণতা ও গুমোট ভাব কেটে যাবে। ঘর আরামদায়ক হবে।

চটের বস্তা বা পাটের আঁশ ছাদের উপর দুপাট করে পেতে দিয়ে তাকে দুঘণ্টা বাদ বাদ পিচকারী দিয়ে এমন ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে যে জল যেন কখনোই না শুকিয়ে যায়। ঘর দারুণ ঠাণ্ডা হবে। হরিদ্বারের ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড ও চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথাকে কাজে লাগিয়ে এয়ার কণ্ডিসনিং এর পরিবর্ত গড়ে তুলছেন।

ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা (২৮ নং নকশা)

মাটির দেয়ালে ভিতের লেভেলে এফোঁড় ওফোঁড় গেঁথে রাখা হয়েছে একটি এড়ো বাঁশের টুকরো আর দেওয়ালের মাথায় রাখা হয়েছে একটি বাঁশের ওয়ালপ্লেট। শক্ত মোটা গ্যালভানাইজড লোহার তার দিয়ে এড়ো বাঁশের সঙ্গে আটকানো হয়েছে ওয়ালপ্লেটকে এবং ওয়ালপ্লেটকে আটকানো হয়েছে ছাদের কাঠামোর র‍্যাফটারে সঙ্গে। এড়োবাঁশটাকে অনড় করতে দুপাশে

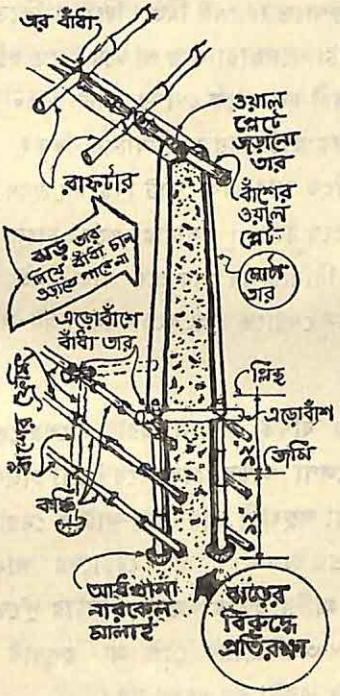

২৮ নং নকশা

দুটি খোঁটা মাটিতে পুঁতে তলায় ফুটিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি নারকেল মালা। দুতিন হাত অন্তর দেয়ালে গাঁথা এড়োবাঁশগুলিকে দুদিকেই তিনটি করে সমান্তরাল বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বাঁধার ফলে ভিত, দেওয়াল, বাঁশের ফ্রেমিং ও ছাদের কাঠামো তারের বন্ধনে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে। ছাদ আর ঝড়ে উড়ে যাবে না। দেয়াল ভিতের ওজন তাকে টেনে রাখবে।

অগ্নি প্রতিরোধক খড়ের চাল

বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পাতলা জালি বানাতে হবে যার খোপগুলি আধ ইঞ্চি

মাপের। এর উপর ১½ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে সুতলী বা নারকেল কেতা দিয়ে খড়কে জালির সঙ্গে বেঁধে আটকে দিতে হবে। এঁটেলমাটির কাদা ও ঘনফুট প্রতি ১৮০০ গ্রাম কুচানো খড় ভাল করে মিশিয়ে সাতদিন পচাতে হবে। তারপর ৮০/১০০ গ্রেডের বিটুমেন, কেরোসিন ও মোম পূর্বে প্লাষ্টার অধ্যায়ে বর্ণিত ভাগে মিশিয়ে বিটুমেন দ্রবণ তৈরী করতে হবে একই পদ্ধতিতে। তারপর কাদা মাটি ও বিটুমেন দ্রবণ মেশাতে হবে প্রতি ঘন ফুট মাটিতে ২০০০ গ্রাম দ্রবণের অনুপাতে। এই মিশ্রণ দিয়ে জালিতে আটকানো খড়ের উপর নীচে ১ ইঞ্চি মোটা পলেস্তারা করে শুকিয়ে নিতে হবে রোদে। শুকাবার পর যে খড়ের বোর্ড তৈরী হল তাকে গোবর মাটি (৫০ : ৫০) দিয়ে বার দুয়েক লেপে দিয়ে ছাদের কাঠামোর সঙ্গে আটকে দিন। অগ্নিনিরোধক খড়ের চাল তৈরী। উপর দিকে আর এক কোট বিটুমেন দ্রবণ পেণ্ট করে দিলে এ চাল জল নিরোধকও হয়ে উঠবে। সাধারণ খড়ের চালে যেখানে ৫ সেকেণ্ডে আগুন লেগে যায়, দশ মিনিটে সব শেষ হয়ে যায়; এই চালে সেখানে এক ঘণ্টা সময় পাবেন আগুন নেবাতে এবং ঘরের লোকজন-আসবাব পত্র সরাতে।

ভূকম্পে অটুট কুটির

দেয়ালের অধ্যায়ে বর্ণিত আধলা ভরাট বাঁশের দেয়াল (৫নং চিত্র) ও উপরে বর্ণিত মাটি লেপা খড়ের চাল দিয়ে তৈরী হালকা কুটির যদি 'ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী তার দিয়ে আটকে নেয়া যায় তা হলে সে কুটির ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। তবে দেয়ালের আধলা বাঁশগুলি খাড়া করে রাখতে হবে এবং মাটির তলায় অন্ততঃ ১ মিটার পুঁতে দিতে হবে। ঘরের আয়তন ২·৫ মিটার×৩ মিটারের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ভূমিকম্প খুব একটা বড় সমস্যা নয়।

পরিবেশ দুষণের হাত থেকে বাঁচা

নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে গৃহস্বামীর কর্মসূচী তিন দফা:

(১) বাড়ীতে ধূমহীন চুল্লী লাগান। চিমনীর মাথাটা জমি থেকে অন্ততঃ চার মিটার উপরে থাকবে।

(২) বাড়ীর আশে পাশে গোটা কতক নিম বা ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছ লাগান। সংলগ্ন জমিতে সবুজ সব্জী ক্ষেত করুন বা দুর্বাঘাস লাগান।

(৩) পায়খানা ও গোয়ালের নর্দমা যুক্ত করে দিন বায়ো-গ্যাস প্লান্টে। প্রস্রাবের জন্য বাড়ীর সকলকে বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যবহার করতে বলুন প্রস্রাবাগার বা ইউরিনাল। প্রস্রাবও গিয়ে পড়ুক বায়ো-গ্যাস প্লান্টে। সম্ভব হলে মাসে একদিন বাড়ীর চতুর্দিকে ডি. ডি. টি. বা ফিনাইল ছড়ান। নিজে তৈরী করে নিলে খুব একটা ব্যয়সাধ্য হবে না। ডি. ডি. টি. উপকারী পোকা মাকড়ও মেরে ফেলে। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডি. ডি. টি. ছড়াবেন না।

এমন বাড়ীতে থাকতে পারলে দেখবেন, সংসারের শ্রী ও স্বাস্থ্য উথ্‌লে উঠছে। চার্চিল বলেছিলেন, "First we shape the building, then the building shapes us (বাড়ী গড়ি আমরা, পরে বাড়ীই গড়ে আমাদের বংশধরদের)।

৪

ধনসম্বল

কিছুদিন আগে হয়ে গেল ১৯৮১ এর নবম ভারতীয় জন গণনা। তার প্রাথমিক রিপোর্ট মাফিক ভারতের জনসংখ্যা ৬৮,৩৮,১০,০৫১ জন। '৫১-এর ৬ষ্ঠ গণনা থেকে '৮১ এর ৯ম গণনা পর্যন্ত জনবৃদ্ধির বাৎসরিক হার শতকরা ২·৪ শতাংশ মত। এ হার অব্যাহত থাকলে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছরটিতেই (২০০১ খৃষ্টাব্দের ১১শ তম গণনায়) ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি অতিক্রম করবে। বর্তমান অনুপাত অনুযায়ী এর মধ্যে ৮০ কোটিই হবে গ্রামবাসী। '৮১-এর জন গণনায় ভারতের গড় জনঘনত্ব (Density) বর্গকিলোমিটারে ২২১ জন (তুলনীয় '৮১-তে পশ্চিমবঙ্গের গড় জনঘনত্ব বর্গকিলোমিটারে ৬১৪ !) অঙ্ক শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের এই ঘনত্ব ২০০১এ দাঁড়াবে বর্গকিলোমিটারে ৯২০। একে আমাদের কৃষি জমি অপ্রতুল। যাও বা আছে তার ৮৪ শতাংশই এক ফসলা। এক্ষেত্রে এই বিপুল জন বিস্ফোরণের সঙ্গে তাল রাখতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে কেবল কৃষি-নির্ভর থাকলে চলবে না। গ্রামীণ স্তরে একটা শিল্প বিপ্লব না করতে পারলে মানুষের, বিশেষতঃ গ্রাম্য মানুষের সচ্ছলতা আনা বা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমাদের নবতর ধনসম্বল পরিকল্পনায় আর একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে। আমরা এতদিন গ্রামের মানুষকে 'গান্ধীবাদ' আর 'দুঃখিনী মায়ের' দোহাই দিয়ে 'মোটা ভাত কাপড়েই' সন্তুষ্ট থাকতে বলে এসেছি। অথচ আমাদের শহরবাসীর হাতে তুলে দিয়েছি 'সুপার ফাইন' চাল আর কাপড় (স্মরণ করুন, টিভি সেণ্টার, এম. টি. পি., ইনডোর ষ্টেডিয়াম, আবাসিক মায়াপুরী সল্টলেক, পথে পথে ফ্লাই ওভার, মার্কারী ভেপার ল্যাম্প, হাওড়ার লাব-ওয়ে, মোহনবাগান মাঠের হালোজেন আলো—এ সবই নাগরিক। যদিও কোলকাতা কিছু ঝলমলে ইন্দ্রপুরী নয়।) এই নীতিগত বৈষম্যই ব্যর্থ করেছে আমাদের গ্রামীণ অগ্রগতির সব প্রচেষ্টাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ উচ্চাকাঙ্খী। অর্থনৈতিক প্রতুলতা, আনুষঙ্গিক বিলাস ব্যসন তার চোখ ধাঁধাবেই। 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড়ের' আদর্শ ও উচ্ছ্বাস তাকে

গ্রামে আটকে রাখতে পারছে না। দল বেঁধে সে কোলকাতার ফুটপাতে খুঁটে বেড়াচ্ছে বিয়ে বাড়ীর উচ্ছিষ্ট চিকেন রোল আর ফিসফ্রাই-এর টুকরো। গ্রামীণ অগ্রগতিকে ধারাবাহিক করতে হলে গ্রামবাসীকে আটকাতে হবে গ্রামে, আকৃষ্ট করে তুলতে হবে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতে। এ কাজে সাফল্য পেতে হলে গ্রামে সৃষ্টি করতে হবে নাগরিক পরিবেশ, নাগরিক সুখসুবিধা। ইংল্যাণ্ডের গ্রামগুলি এ বাবদে সুবিখ্যাত। রংগীন টিভি, এস. টি. ডি. টেলিফোন, গাড়ী, কাঁচের মত মসৃণ রাস্তা, এয়ার কণ্ডিসানড পাব, টাটকা খবরের কাগজ, সেণ্ট্রাল হিটিং, ক্লাব-চার্চ-স্কুল সব মিলিয়ে সেগুলি শহরেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। উপরি পাওনা টাটকা বাতাস, টাটকা সব্জী। তাই দেশের ধনিক শ্রেণীর বাস সেখানে। আমাদের গ্রামগুলিকে এমনি আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হলে বহুগুণ চাঙ্গা করে তুলতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতিকে। এই স্তরে পৌছাতে হলে অর্থনীতিকে কেবল কৃষি-নির্ভর রাখলে চলবে না। শিল্প সমৃদ্ধি তার একান্তই প্রয়োজন।

এই অর্থ নৈতিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মূল যন্ত্র পঞ্চায়েত। তার করণীয় অনেক কিছু :

(ক) শিল্প নির্বাচন—যে সব শিল্প স্থানীয় ভাবে সহজলভ্য মালমশলা ও ও কর্মনৈপুণ্য দিয়ে গড়ে তোলা যাবে সহজেই, যে সব শিল্পকাণ্ডে হস্তশক্তির প্রয়োগ অধিক, জ্বালানীর দরকার কম এবং যে সব শিল্প সম্ভারের চাহিদা যথেষ্ট—সেই সব শিল্পের মধ্যে থেকে বাছাই করা শিল্প গড়ে তুলতে হবে গ্রামে গ্রামে। এই শিল্প বাছাইয়ে আর একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে বিশেষ করে। গ্রামীণ শিল্পশৈলীকে হতে হবে কৃষি ও পশুপালনের পরিপূরক। একটির ফেলে দেওয়া অংশ যাতে কাজে লাগানো যায় অপরটিতে। যেমন আখের চাষ—গুড় শিল্প—মুরগী পালন। আখ থেকে গুড় তৈরী হবার পর যে কাথ ও আখের ছোবড়া ফেলা যায়, তা কাজে লাগে মুরগী পালনে। কাথ মেশানো যায় মুরগীর ফীডে (Feed), ছোবড়া দিয়ে তৈরী হয় ডিপলিটার। একবছর বাদে মুরগীর মলভর্তি লিটার ফেলে নতুন লিটার যখন দেওয়া হয় তখন ফেলে দেওয়া লিটার আখ ক্ষেতে ব্যবহার করা যায় সার হিসাবে।

সাইকেল (Cycle)টা দাঁড়ালো এই রকম :

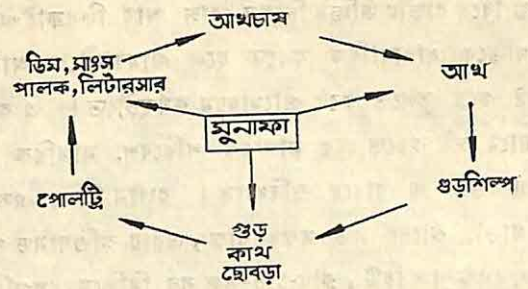

এই রকম আরো বহুতর সাইকেল নির্বাচন করতে পারবেন পঞ্চায়েত। যেমন ধরুন চাষের আবর্জনা থেকে মেলে পশুপালনের খাদ্য। চাষ ও পশুপালনের আবর্জনা থেকে মাছের পুষ্টিসাধন। মাছের ফেলে দেওয়া নাড়িভুড়ি দিয়ে চাষের সার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক ভেড়ীওয়ালা মুরগী চাষীকে দেখেছিলাম মুরগী ড্রেস করার রক্ত মাছকে খাওয়াতে এবং শুঁটকী মাছের কারবারে ফেলে দেওয়া আন্ত্রিক অংশ থেকে মুরগী-খাদ্য ফিসমিল তৈরী করতে। এই ভাবে 'মৌমাছি পালন-ফলচাষ-ক্যানিং' কিম্বা 'ধানচাষ-সিমেণ্টতৈরী' অথবা 'গোপালন-দুগ্ধ সমবায়-অষুধ শিল্প' ইত্যাদি নানান সাইকেল গড়ে তুলে মুনাফাকে দ্বিগুণ, তিনগুণ করে তোলা যায়।

(খ) শিল্প সমবায় গঠন—কৃষির মতই গ্রামীণ শিল্পেও সমবেত প্রচেষ্টার দাম অনেক। নাগরিক ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা এগিয়ে আসেন বিনিয়োগ করে মুনাফা লুটতে। গ্রামীণ আঙ্গিকে এটা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছিতও নয়। তাই সেখানে 'ব্যক্তি' সত্তাকে যতটা পারা যায় বাদ দিয়ে শিল্প পরিচালনের ভার সমবায়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। গ্রামীণ শিল্প সমবায় যে কি বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করতে পারে আনন্দের কায়রা জেলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সংস্থা তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁদের দুগ্ধজাত শিল্পসম্ভার আনন্দকে ভারত-বিখ্যাত করে তুলেছে। গ্রামীণ শিল্প সমবায়ের প্রযুক্তিগত কর্মসূচী পাঁচ দফা :

(১) শিল্পে যোগদানে ইচ্ছুক যুবশক্তিকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্তদের নিয়ে নিপুণতর কর্মীবাহিনী গঠন।

(২) শিল্পের প্রয়োজনে উন্নত জাতের বীজ, সঙ্কর পশু, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ জোগাড় ও বণ্টন।

(৩) যন্ত্রাংশ মেরামতির কারখানা ও উৎপাদনের মান নির্ধারক পরীক্ষাগার পরিচালন।

(৪) উৎপাদিত মালের বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা।

(৫) উৎপাদন প্রযুক্তিকে উন্নততর ও সহজ করার জন্য গবেষণাগার পরিচালন।

এই কর্মসূচী শিল্পের ব্যক্তিগত পরিচালনায়, বিশেষতঃ গ্রামীণ আঙ্গিকে সম্ভব নয়। সমবায়ই একমাত্র উত্তর।

(গ) শিল্প পরিবেশ সৃজন—প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গ্রামগুলিতে গড়ে উঠেছে কৃষি-সমাজ যার ভিত্তি হচ্ছে ধর্ম (বা ধর্মীয় কুসংস্কার), লোকাচার ও লোক সংস্কৃতি। বিজ্ঞান চর্চা সেখানে কোনদিন হয় নি বললেই চলে। অথচ এই বিজ্ঞানই হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির আত্মা। প্রযুক্তির অপর নাম ফলিত বিজ্ঞান। কাজেই শিল্পস্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে গ্রামীণ যুবসম্প্রদায়কে বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে হবে। কেবলমাত্র ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তিতেই তা সম্ভব নয়। এর জন্য পাড়ায় পাড়ায় গড়তে হবে বিজ্ঞান ক্লাব। ছোটদের উৎসাহী করে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি গড়ার কাজে। তাদের তৈরী বিনা-বিদ্যুতের ফ্রিজ, বিনা তেলের পাম্প, সৌরশক্তি-চালিত ঢেঁকি, সংরক্ষিত তরমুজ, ফুলকপি, সীম বা মাছের প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বিজ্ঞানকে ঢুকিয়ে দিতে হবে গ্রামীণ জনমানসের অন্তরঙ্গতম স্থলে। তবেই গড়ে উঠবে শিল্পের পরিবেশ।

উপদেশ দেওয়া সোজা। তাকে কাজে পরিণত করা কি ততটাই সোজা? এইসব কাজে যে আর্থিক প্রয়োজন সেটা আসবে কোথা থেকে? ইংরাজিতে একটা কথা আছে Where there is a will, there is a way (বাংলায়—যে খায় চিনি, তাকে চিনি যোগান চিন্তামণি)। উপযুক্ত নেতৃত্বে, কাজ করার ইচ্ছা ও গ্রামবাসীর সহযোগিতা পেলে কতখানি কাজ করা যায়, বর্ধমানের সাহেবগঞ্জ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত তার উজ্জ্বল উদাহরণ।' ৭৮ এর শেষে নির্বাচিত এই পঞ্চায়েত '৭৯ এর গোড়া থেকে '৮১ এর মাঝ বরাবর এই

আড়াই বছরে আয় করেছে সাকুল্যে এক লক্ষ টাকা। আর কাজের ফিরিস্তিটা শুনুন :

(১) নলকূপ মেরামত হয়েছে ২০টি, নতুন বসেছে ৯টি।

(২) ঘোলদা, গ্রামডি, মান্দারবাটি, শিলাকোট ও ওরগ্রামে মোট ১৫ কিলোমিটার লিংক রোড তৈরী হয়েছে।

(৩) ২ কিলোমিটার খাল কেটে ৩০০০ বিঘা জমি আনা হয়েছে সেচের আওতায়।

(৪) ওরগ্রাম হাটতলায় তৈরী হয়েছে মুক্তমঞ্চ।

(৫) লাইব্রেরীর জন্য এসেছে ১০০০ বই।

(৬) হিন্দুদের শ্মশানে তৈরী হয়েছে পাকা শেড, মুসলিম কবরখানাকে ঘেরা হয়েছে উঁচু পাঁচিল দিয়ে।

(৭) পাঁচ মাইল পথের দুধারে লাগানো হয়েছে গাছ।

(৮) ক্ষেতহীন মজুরদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ৪০,০০০ শ্রমদিবস।

চিনি যোগাচ্ছেন চিন্তামণি! সাহেবগঞ্জ ২নং-এ যা সম্ভব, বাকি ৩২৩টি পঞ্চায়েতেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? অবশ্য এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার। সাহেবগঞ্জে এত কাজ হয়েছে কিন্তু তালিকার মধ্যে বিজ্ঞান বা শিল্প প্রযুক্তির ক্ষেত্রভুক্ত কিছুই নেই। এ ভুল শুধরে নেওয়া দরকার। এক্ষুনি।

গ্রামীণ প্রযুক্তি মূলতঃ দুভাগে বিভক্ত—এক, গবেষণাগারে সৃজিত সূত্র এবং দুই, দেশব্যাপী প্রয়োগক্ষেত্রে তার ব্যবহার। প্রথমটি অনুশীলন হয় জাতীয় স্তরে বা ক্ষেত্রবিশেষ আন্তর্জাতিক স্তরে (যেমন ধরুন, মাছের মজুত ব্যবস্থায় তরল নাইট্রোজেন দিয়ে হিমায়ন; প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার উন্নতি সাধন করেছেন ভারতীয় ক্রায়োজেনিক কাউন্সিল। কিম্বা বাধক হরমোনের (Growth retarding hormone) প্রয়োগে গাছের বাড় কমিয়ে আপেল, সয়াবীন বা আই. আর. এইট. ধানের ফলন বাড়ানো; প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার উন্নতি সাধন করেছেন আপেল ও সয়াবীনের বেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং ধানগাছের বেলায় ম্যানিলার আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থা। অথবা প্লাসমিড নামক ব্যাকটিরিয়া নিঃসৃত জীন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারীং-এর সাহায্যে গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার গবেষণা যাতে করে সার প্রয়োগ বন্ধ করে দিলেও গাছ বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন টেনে নিজেই শ্রীবৃদ্ধি করে চলবে ও কৃষকের বেঁচে যাবে সার দেয়ার খরচ; প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তার উন্নতি সাধন

করছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি বা জৈব রসায়ন বিভাগ।) এখানে গ্রাম বা পঞ্চায়েতী স্তরে করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু গবেষণাগার থেকে যে সূত্র পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তির রূপ ধরে বেরিয়ে আসছে তার ব্যবহারিক প্রয়োগে তাকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলাই হচ্ছে গ্রামীণ প্রযুক্তির দ্বিতীয় এবং অধিকতর প্রয়োজনীয় ভাগ যার পূর্ণ দায়িত্ব পঞ্চায়েত ও তার অধীনস্ত শিল্প ও কৃষি সমবায়গুলির। কাজেই এ বাবদ আর একটু আলোচনার গভীরে যাওয়া যাক।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিন্যাসের রূপরেখাটা এইরকম :

কাঠ—দার্জিলীং, ডুয়ার্স, পুরুলিয়া, সুন্দরবন।

ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী—হুগলী (ব্যাণ্ডেল থেকে বাটানগর), ও গঙ্গার অপর তীরে হাওড়া, আসানসোল-দুর্গাপুর।

কয়লা ও লোহা—আসানসোল-দুর্গাপুর।

চা—দার্জিলীং ও ডুয়ার্স।

পাট—হুগলী নদীর তীরে।

রেশম—মালদা, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর।

লাক্ষা—বাঁকুড়া-পুরুলিয়া।

চিনি—বীরভূমের আহমেদপুর অঞ্চল।

খনিজ পদার্থের (কয়লা, বকসাইট, চুনাপাথর, সিলিকন, কেওলিন জিপসাম, পাথরকুচি ইত্যাদি) ৯৫ শতাংশই পাওয়া যায় পশ্চিম প্রান্তের পুরুলিয়া প্লেটুতে। কাজেই ভারী শিল্প যা কিছু (লোহা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেন্ট, ফায়ার ব্রিক্স ইত্যাদি) প্রায় সবই গড়ে উঠেছে ওই অঞ্চলে! বাকি অংশ কৃষি-নির্ভর বা বন-নির্ভর। কাজেই এসব অঞ্চলের শিল্পের প্রসার করতে হলে শিল্পকেও হতে হবে কৃষি-নির্ভর বা বন-নির্ভর। অর্থাৎ এমন সব শিল্প গড়ে তুলতে হবে যার কাঁচামাল হবে কৃষিজাত বা বনজাত। অবশ্য দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রোপকূলে জলের লবণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং ক্লোরিণ প্রস্তুত করা যায়। তার প্রযুক্তিও আমাদের আয়ত্বে। নদী-মাতৃক বাংলাদেশের নদীর বালিয়াড়ী থেকে কাঁচামাল সিলিকন উৎপাদনেরও একটা বড় সম্ভাবনা আছে। উৎসাহীরা খতিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু বাকি অঞ্চলের শিল্পকে হতে হবে কৃষি-নির্ভর (যেমন চিনি, বনস্পতি, তেল, রংশিল্পের নানান কাঁচামাল, অ্যালকোহল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, পি. ভি. সি.

ও লুব্রিকেন্ট তেল প্রস্তুত) কিম্বা বন-নির্ভর (যেমন তারপিন, পাইন, সিট্রোনেলা, ইউক্যালিপটাস, পামরোজা প্রভৃতি তেল, কর্পূর, প্লাইউড, কাঠের চিপ-বোর্ড বা জলজ উদ্ভিদ থেকে সোডিয়াম অ্যালগিনেট, পটাশিয়াম, আইওডিন প্রস্তুত)। বি. এস. আই. (Botanical Survey of India) প্রস্তুত করেছেন ভারতীয় ওষধি গাছের তালিকা যাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে

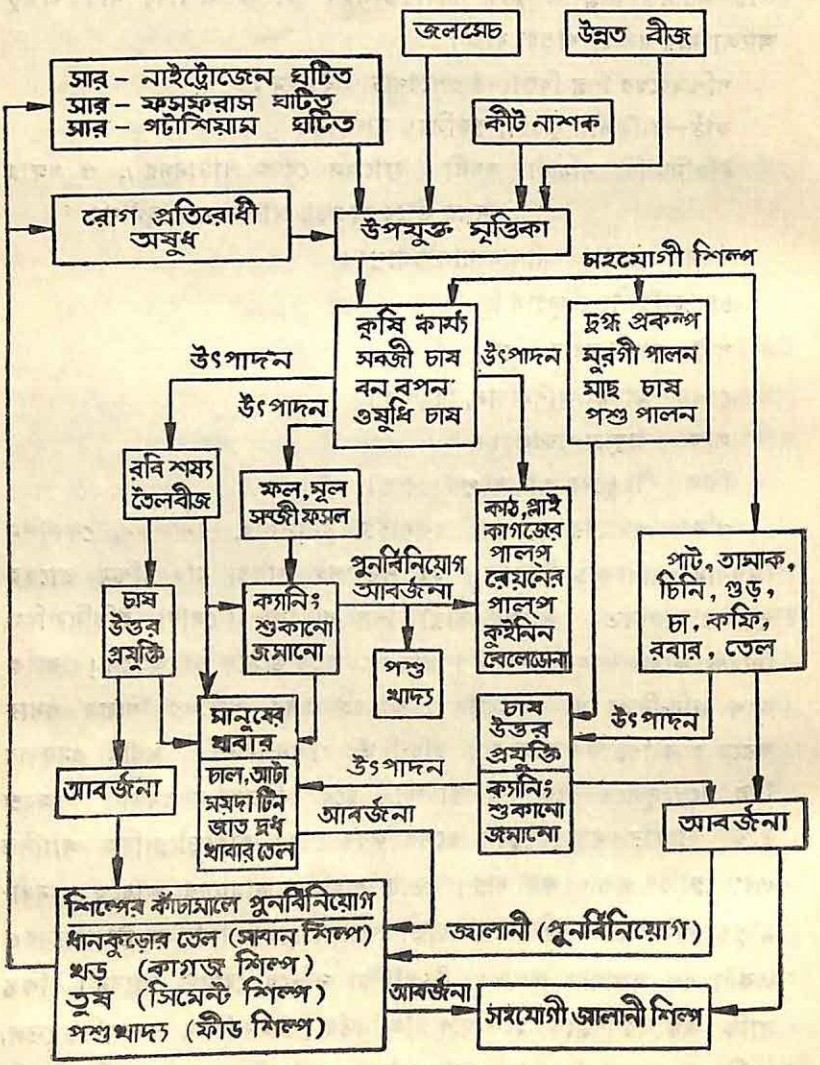

পারে ঔষধ শিল্প। এও এক কৃষিনির্ভর শিল্প যার সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে বিপুল। প্রাণিজ শিল্পের (যেমন জমা বা শুকনো পাউডার দুধ, ডিমের পাউডার; জমানো মাংস, মাছ, চিংড়ি; ঘি, চীজ, বাটার; ছানাজাত অষুধ বা মিষ্টি; ফিসমিল, হাড়ের গুঁড়ো, শিংজাত শিল্পকর্ম, শাঁখা, পালকের গদি, উলশিল্প ইত্যাদি) সম্ভাবনাও সমান উজ্জ্বল।

উপরের এই আলোচনা থেকে তৈরী করা যায় আগের পৃষ্ঠার চার্টটা, যা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রযুক্তির সঙ্গে একান্তভাবে মানানসই। এই চার্ট অনুযায়ী পুনর্বিনিয়োগ কৌশলে যে সব শিল্পে কম জ্বালানী ও বেশী কায়িক শ্রমের প্রয়োজন, পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশ ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিচার করে তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত কিছু শিল্পের প্রযুক্তি-গত দিকটা নিয়ে গভীরতর আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে; এই সব শিল্পকে তিন ভাগ করে:

—কুটির শিল্প, জৈব শিল্প ও কৃষি শিল্প।

যদিও আমাদের এই প্রস্তাবিত গ্রামীণ ধনসম্বল মূলতঃ শিল্প-নির্ভর; ভুললে চলবে না যে ওই শিল্প প্রধানতঃ কৃষি, বন সম্পদ ও গৃহপালিত পশুপাখীর কাছ থেকেই আহরণ করবে তাদের কাঁচামাল, রি-এজেন্টস ও জ্বালানী। কাজেই শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিক্ষেত্র বন ও পশুপালনেও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি মেশাতে হবে। নইলে শিল্পের কাঁচামালে টান পড়বে। অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রদীপ নিভে আসবে। কাজেই ওদিকটায় একটু নজর দেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় হচ্ছে ২০০ থেকে ২৩০ সেন্টিমিটার। শীতকালটা শুকনো। রবিশস্যের জন্য সেচের প্রয়োজন অথচ সেচ ব্যবস্থার দিক থেকে আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকখানি পেছিয়ে। ফলে আমাদের মোট চাষযোগ্য জমির ৮৪ শতাংশেই বছরে একটিবার ফসল ফলে। পতিত জমি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নেই। অতএব চাষের জমি বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর সহজপন্থা আমরা বেছে নিতে পারছি না। তাছাড়া চাষের জমি বাড়াবার নেশায় আমরা বন কেটে ফেলছি। এটাও অন্যায় হচ্ছে। শুধু যে বনজ সম্পদই হারাচ্ছি তাই নয়, দেশে খরা ডেকে এনে কৃষিরও সর্বনাশ করছি। পশ্চিমবঙ্গে বন এলাকা হচ্ছে ১২ শতাংশ। শীতল সরস পরিবেশের জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম বিশ শতাংশ। অতএব বন কাটাও বন্ধ। এক্ষেত্রে উপায়টা

কি ? একমাত্র উপায় আরো বেশী চাষের জমিকে ক্রমাগত দু-ফসলা করে তোলা। এইভাবে সব জমিকে যদি দু-ফসলা করে তুলতে পারা যায় তা হলে আমাদের কৃষি উৎপাদন এখানকার তুলনায় পৌণে দুগুণ হয়ে যাবে। এখানে প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে দুভাবে।

প্রথমতঃ সেচ প্রযুক্তি। যেখানে সম্ভব খাল কেটে এবং যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে কূপ বা নলকূপ থেকে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে হালকা পাইপ মারফৎ যাতে সেচের জল নষ্ট হতে না পারে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আঞ্চলিক প্রকল্পের 'জল সরবরাহ—সেচ ও পানীয়' অনুচ্ছেদে দেখেছি এই প্রযুক্তি অবলম্বনে সেচ দিলে একটি নলকূপে ৬ একরের জায়গায় ১১ একর পর্যন্ত জল সেচ করা যায়। প্রথম অধ্যায়ের কৃষিপ্রযুক্তি অনুচ্ছেদে আমরা দেখেছি জলের বিজ্ঞান-সম্মত রেশনিং-এ ফলন বাড়ে। এইভাবে প্রযুক্তি প্রয়োগে স্বল্প খরচে সেচের কার্যকারিতা চট করে বাড়িয়ে দিতে পারি ২/৩ গুণ। দ্বিতীয়তঃ কৃষি প্রযুক্তি। বাড়তি চাষ করা যায় কিছু কিছু যাতে সেচের প্রয়োজন নেই বা খুবই অল্প। এইভাবে সুন্দরবনের পাঁচটি থানা,—সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও মথুরাপুরে বিনা সেচে উন্নত জাতের তরমুজের চাষ করে গত ৬/৭ বছরে এক বিস্তীর্ণ এলাকাকে দু-ফসলায় পরিণত করা হয়েছে। এসব জমিতে বছরে একবারই ফসল হত আগে—বিঘা প্রতি ৫/৭ মন ধান ! কিছু জমিতে অবশ্য আগে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে বছরে বিশ পঁচিশ টাকার লঙ্কা ফলানো হত। আর আজ দু-ফসলা জমিতে বিঘে প্রতি আয় নীট ১০০০ টাকা। অবশ্য শুনেছি গত বছর ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থার দরুণ এই তরমুজ চাষীরা দারুন ভাবে মার খেয়েছেন। তার জন্য কিন্তু দু ফসলা প্রযুক্তিকে দায়ী করলে চলবে না। বরং এই দুর্ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় আর একটি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনার কথা। তা হল সুপরিকল্পিত সমবায়িক বিক্রয় ব্যবস্থার। পচনশীল কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয় ব্যবস্থাকে উন্নত, ত্বরান্বিত করতে না পারলে উন্নতি অসম্ভব। এইভাবে বাড়তি খেজুরের চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে গোবরডাঙ্গা অঞ্চলে তাতে দেখা গেছে বিনা সেচ, সার ও পরিশ্রমে প্রতি গাছ থেকে ৫০ টাকা মত লাভ হতে পারে। ঘরের খুঁটি, জালানী, খেজুর রস, গুড়, পাটালী, দলুয়া চিনি, খেজুর পাতার মাদুর—খেজুর গাছ-কেন্দ্রিক শিল্পকে ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারলে অন্ততঃ আড়াই লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। এই সব কৃষি প্রযুক্তি গাঙ্গেয়

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চলতে পারে। এই টুকরো টুকরো প্রযুক্তির সঙ্গে যদি মেশানো যায় যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি (যান্ত্রিক লাঙ্গল, চার-সারি বপণ যন্ত্র, পুষা কাটাই যন্ত্র, গম-ঝাড়া যন্ত্র, কিষাণ-মিত্র, আখ মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম ভারতীয় কৃষি-যন্ত্রের গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন ইনভেনসান প্রোমশন বোর্ড) তা হলে খুব অল্প দিনেই বহুগুণ বেড়ে যাবে কৃষি উৎপাদন (২ নং নকশা)। শস্যগোলার গঠন ত্রুটিতে ইঁদুর, পাখী ও বর্ষায় আমাদের বহু শস্য নষ্ট করে। মজুতের উন্নত ব্যবস্থা করাও দরকার।

সার ব্যবহারের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় জাপান, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে হেক্টার প্রতি ৪০০ কেজি সার ব্যবহার করা হয়। এমন কি ইজিপ্ত বা মিশরেও হয় হেক্টার প্রতি ১৫০ কেজি। আর ভারতে ৩০ কেজি। এই সারের স্বল্পতাও আমাদের অল্প ফলনের জন্য দায়ী। মাঝে মাঝে জমিতে দুই ফসলের মাঝে নেপিয়ার, লুসার্ণ বা বারসীম বা এলিফাণ্ট গ্রাসের চাষ করলে জমির উর্বরতাও বাড়ে, কিছু পশুখাদ্যের উৎপাদনও হয়ে যায় ফাঁকতালে।

আমাদের বনাঞ্চল মাত্র ১২০০০ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে উত্তর বাংলায় রয়েছে ৩০০০ ব. কি. মি, রাণীগঞ্জ-পুরুলিয়ায় ৪৮০০ ব. কি. মি. এবং সুন্দরবনে ৪২০০ ব. কি. মি.। আরো ৮০০০ বর্গকিলোমিটার বাড়ানো উচিত, বিশেষ করে খরা পীড়িত বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে। অনাবাদী জমির যতটা পারা যায় ফল চাষ করলে বন বাড়বে, বাড়বে বনজ সম্পদ ও বন-নির্ভর শিল্প, উপকার হবে আবাদী জমিরও। সবল হয়ে উঠবে আমাদের ধন সম্বল।

ধনসম্বল অধ্যায় শেষ করবার আগে একটি ভাবী কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা খুবই জরুরী কারণ ভবিষ্যৎ গ্রামীণ অর্থনাতির সাফল্য এর উপর অনেকখানিই নির্ভর করছে। ১৯৬৫ থেকে আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম বীজ। ফলনও বেড়ে চলেছে অবিশ্বাস্য হারে। উন্নত জাতের বীজ হলেই অবশ্য উৎপাদন বাড়ে না। সঙ্গে চাই উপযুক্ত সেচের জল, সার ও কীটনাশক। এ জাতের ধান ও গমের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত কম যে রোগনাশক ওষুধ বিনা ফলন অসম্ভব। সবুজ বিপ্লবের প্রথম দিকে নজরে না পড়লেও এখন বোঝা যাচ্ছে যে এই রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধের যদৃচ্ছ ব্যবহারে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত কমে আসছে। তাছাড়া এ ধরনের চাষ খুব ব্যয়বহুল হওয়ায় (সেচ-সার-

নাশক ওষুধ বাবদ মোটা খরচা) খুব ধনী চাষী ছাড়া অন্যের পক্ষে করাও সম্ভব হচ্ছে না। 'সবুজ বিপ্লব' 'সর্বজন হিতায়' হয়ে উঠতে পারছে না। নলকূপ-সেচের ফলে ভূগর্ভ জলের লবণ কৃষিযোগ্য জমির উর্বরতা নষ্ট করে দিচ্ছে। উচ্চফলনশীল চাষের প্রবর্তক নর্মান বোলর্গ বলেন পাঁচ-সাত বছর পরে, উচ্চ-ফলনশীল বীজ কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বর্জন করে মধ্যফলনশীল বীজের চাষ করা উচিত। এতে সবুজ বিপ্লব বজায় থাকবে না বটে কিন্তু চাষের জমি বাঁচবে, রাসায়নিক সার ও নাশক ওষুধের ব্যবহার কমবে, ব্যয় বহুল সেচ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে বৃষ্টি পাতের উপর নির্ভর করা যাবে। ধনসম্বল বজায় থাকবে।

কীটনাশকের বেহিসেবী ব্যবহারে ক্ষতিকর পোকাদের প্রতিরোধী ক্ষমতা গড়ে উঠেছে অথচ মরে যাচ্ছে এইসব পোকাদের ধ্বংস করে এমন অজস্র উপকারী কীট, কেঁচো, ব্যাং, মাছ। অনেক দেশে আইন করে ডি. ডি. টি প্রয়োগ বন্ধ হচ্ছে। পরিবর্তে চেষ্টা হচ্ছে উপকারী কীট, কেঁচো, ব্যাং, মাছকে কাজে লাগাবার, কৃত্রিম যৌন সৌরভ ছড়িয়ে ক্ষতিকর পতঙ্গকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার এবং রাসায়নিকের সাহায্যে পুংকীটের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে বংশবৃদ্ধি রোধ করার। মধ্য-ফলনশীল বীজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এসব প্রযুক্তিকেও গ্রহণ করতে হবে—ধন সম্বল বাঁচাতে। এ ছাড়া মনে হয় বলা দরকার যে কোন ধরণের প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় বেশী উপযোগী। যেমন বলা যায় যে, যে প্রযুক্তিবিদ্যা মূলধন আশ্রয়ী নয়, তেল বা অন্যান্য শক্তির উপর নির্ভরতা কম, যার উপকরণ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং যে প্রযুক্তিবিদ্যার স্থাপনা ও প্রয়োগ এবং মেরামতী স্থানীয় মানুষ বাইরের সাহায্য ছাড়াই করতে পারবেন এবং যে প্রযুক্তিবিদ্যা অঞ্চলের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযুক্তি পূর্ণ, তাকেই সাধারণভাবে আমরা সঠিক প্রযুক্তিবিদ্যা বলি। এই সংজ্ঞাটি আমাকে দিয়েছিলেন ডঃ বিপ্লব দাসগুপ্ত। তাঁর দেওয়া সঠিক প্রযুক্তি বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজীর এই চমৎকার সংজ্ঞাটির ফরমূলা ধরেই ফেনানো হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলি। পদে পদে এই সংজ্ঞারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে।

৫

বিকল্প জ্বালানী

কাঠ, কয়লা, তেল, গ্যাস—আজকের দিনের প্রায় সব জ্বালানীই জীবাশ্ম। এদের তৈরী করতে প্রকৃতির লাগে হাজার হাজার বছর সময় আর মানুষ খরচ করে ফেলে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ফলে এদের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। প্রয়োজন হয়ে পড়ছে শক্তির বিকল্প সন্ধানের। জ্বালানী হিসাবে কাঠের থেকে কয়লা, কয়লার থেকে তেল ও গ্যাস উৎকৃষ্টতর। কাজেই তেল ও গ্যাসের চাহিদা বেড়েই চলেছে। তেলের ব্যয় বাড়াতে কয়লার ব্যবহার কিন্তু কমছে না। জগৎব্যাপী শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বগ্রাসী জ্বালানীর ক্ষুধা সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে বিগত অর্ধ শতকে কয়লার ব্যবহার আড়াই গুণ ও তেলের ব্যবহার পনেরো গুণ বেড়েছে। মাথাপিছু শক্তির পরিমাণ বাড়িয়ে অনুন্নত দেশগুলিও শিল্পোন্নতির প্রতিযোগিতায় নামছে। শক্তির মজুত ভাণ্ডারে ক্রমশই টান

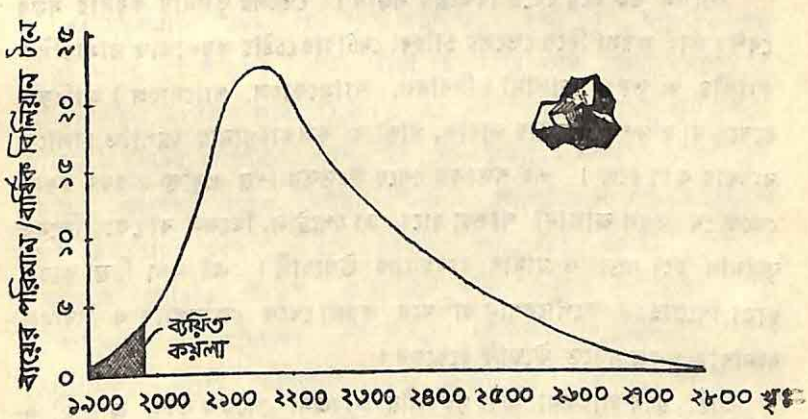

২৯নং নকশা—কয়লার সঞ্চয় ও ব্যবহার

পড়ছে। পৃথিবীতে ব্যবহারযোগ্য কয়লার সঞ্চয় ৭৬০০ বিলিয়ান টন। ২৯নং নকশায় দেখা যাবে ২৮০০ খৃষ্টাব্দ অবধি বার্ষিক কি হারে কয়লার ব্যবহার চলবে। ব্যয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ তেলের ক্ষেত্রে আরো স্বল্প স্থায়ী (৩০নং নকশা)। আশীর দশকের সুরু পর্যন্ত আমরা মোট তৈল ভাণ্ডারের প্রায় অর্ধেক পুড়িয়ে ফেলেছি। বাকি অর্ধেক দিয়ে টেনেটুনে

১৯৯৬/৯৭ খৃঃ পর্যন্ত চালানো যাবে। সেই সঙ্গে আশা আগামী বিশ বছরে, এখনও ভূপৃষ্ঠে লুকানো রয়েছে যে অনুমিত ১৩২ বিলিয়ান টন, তা খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে ২০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে আমাদের বিকল্প জ্বালানী আবিষ্কার করে ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবেই।

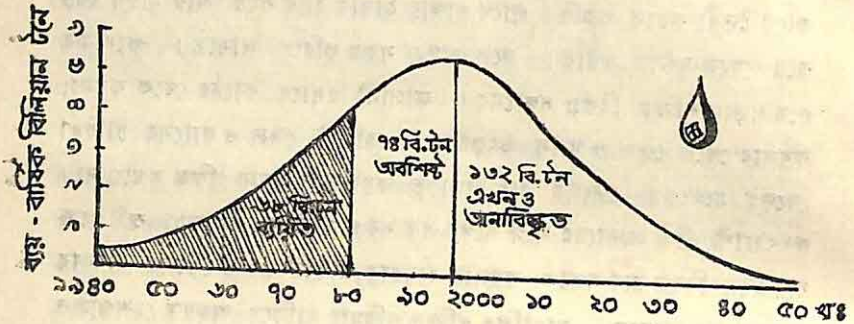

৩০নং নকশা—খনিজ তেলের সঞ্চয় ও ব্যবহার

কাজেই শুরু হয়ে গেছে বিকল্পের সন্ধান। তেলের তুলনায় কয়লার সঞ্চয় বেশী। তাই কয়লা দিয়ে তেলের চাহিদা মেটাবার চেষ্টায় কয়লাজাত রাসায়নিক গ্যাসীয় ও তরল জ্বালানী (মিথানল, অ্যালকোহল, গ্যাসোহল) আবিষ্কৃত হয়েছে যা দক্ষিণ আফ্রিকায় জাহাজ, গাড়ী বা কলকারখানার যন্ত্রপাতি চালাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই শতকের শেষে উন্নততর শিল্প প্রযুক্তি মারফৎ কয়লা থেকে যে তরল জ্বালানী পাওয়া যাবে তা পেট্রোল, ডিজেল বা কেরোসিনের তুলনায় হবে সস্তা ও গ্রামীণ ব্যবহারের উপযোগী। এই কথা চিন্তা করেই রাজ্য শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশান রাণীগঞ্জে কয়লা থেকে কোলগ্যাস ও মিথানল বানাবার প্রকল্প গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন।

কাঠ, কৃষি আবর্জনা এবং গৃহস্থলীর আবর্জনা থেকেও তরল জ্বালানী ও অন্যান্য রাসায়নিক (বেঞ্জিন, ফেনল, মিথানল, অ্যাসিটোন, ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি প্লাষ্টিক ও রং শিল্পের কাঁচামাল) উৎপাদনের প্রযুক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে আমেরিকা ও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে। এ প্রযুক্তি আমাদের ১২০০ বর্গ-কিলোমিটার বনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বনজ শিল্পের ও সেই সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে। মিথানল একটি সুরাসার বা অ্যালকোহল যা পেট্রোলের সঙ্গে শতকরা ২০ ভাগ মিশেল দিয়ে গ্যাসোহল

তৈরী করা হয় খাঁটি পেট্রোলের সহজ পরিবর্ত হিসাবে। এ প্রযুক্তি আমাদের গ্রামেও চালানো যেতে পারে। ভিয়েনার এক বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট বলছেন ২০৩০ খৃষ্টাব্দে এ যখন বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ মিলিয়ানে পৌছবে তখন তৈলশক্তির চাহিদা ১·৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২·৪ শতাংশে দাঁড়াবে যার মাত্র ৬১ ভাগ মেটাতে পারবে খনিজ তেল। বাকি ৩৯ ভাগ চাহিদা পুরণ করতে হবে কয়লা, কাঠ ও আবর্জনা-জাত তরল জ্বালানী দিয়ে। ইতিমধ্যে কয়লার প্রয়োজন বেড়ে দাঁড়াবে বার্ষিক ১৩০০ মিলিয়ান টন যার ৫৬ শতাংশই ব্যয় হবে কৃত্রিম তেল বা তরল জ্বালানী উৎপাদনে। এ হারে কয়লা ব্যবহারে ২১৬০ খৃষ্টাব্দের পর কয়লার ভাঁড়ারেও টান পড়বে (২৯ নং নকশা)। এখানে ভারসাম্য রাখতে চিন্তা করতে হবে ভিন্নতর বিকল্পের। তাছাড়া কয়লা থেকে জ্বালানী (তরল ও গ্যাস) উৎপাদনের দক্ষতা (Efficiency) খুব উঁচু নয়। কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা এর থেকে অনেক বেশী। কোলগ্যাস বা মিথেন তৈরী করতে ১৫০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ, বর্গ সেন্টিমিটারে ৭০ কেজি চাপ ও হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়। এসব হুজ্জোত হাঙ্গামা আমাদের গ্রামীণ প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খায় না। অতএব চলুন খোঁজ করা যাক বিকল্পের।

এই অনুসন্ধানে প্রথম নজরে পড়ে জলশক্তি। জলবিদ্যুৎ (যার উৎপাদন দক্ষতা ৮০% থেকে ৯০%) তো আমাদের কাছে এখন পুরানো জিনিষ। ঋতু ভেদে এর উৎপাদন কমে বাড়ে। এর জল সঞ্চয়ের প্রয়োজনের সঙ্গে আমাদের সেচের প্রয়োজন খাপ খায় না পুরোপুরি ভাবে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক ব্যয়ও বিপুল। কাজেই জলশক্তির ভিন্নতর প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণার অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। নদী এবং সমুদ্রের মোহনায় অপরিমেয় জোয়ার ভাঁটার প্রাকৃতিক শক্তি কাজে লাগানোর চেষ্টা পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের দেশেও চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ৩০০ কিলোমিটার ব্যাপী সমুদ্রোপকূলে ও দেশের বহু নদনদীর তীরে এই জলোচ্ছাসের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে একটা বড়রকম বিকল্প শক্তির সন্ধান মিলবে। জল শক্তির পরেই যা মনে আসে তা হল বায়ুশক্তি। বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর সমস্ত জলযান যে পালতুলে পৃথিবী চষে বেড়াত, তার মূলে ছিল এই বায়ুশক্তি। বার্মিহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌরশক্তি বিভাগের প্রধান ডঃ লেসলী জেশ্চ্ বলেছেন দু-দশকের মধ্যে ব্রিটেনের মোট শক্তি ব্যয়ের ১৫ শতাংশ যোগাবে বায়ু ও সূর্য। বন্যা-বিধ্বস্ত হল্যাণ্ডে জল নিষ্কাশনের জন্য

উইণ্ড মিল মারফৎ কাজে লাগানো হয়েছিল বায়ুশক্তিকে ১৪শ খৃষ্টাব্দের গোড়া থেকেই। বালিয়াড়ী ভরা হল্যাণ্ডের চেহারা আজ পাল্টে গেছে উইণ্ড মিলের দৌলতে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ও পার্বত্য অঞ্চলে (যেখানে বাতাসের বেগ যথেষ্ট) উইণ্ড মিল দিয়ে জল উঁচুতে তুলে নিতে হবে বাতাস বেগবতী থাকতে থাকতে। তারপর বাতাস পড়ে গেলেও সেই জলকে নীচে নামাবার পথে টারবাইন চালিয়ে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায় খুশীমত। এইভাবে বায়ুশক্তিকে জলশক্তির মাধ্যমে সঞ্চয় করা যায় ও খুশীমত ব্যয় করা যায় যখন বাতাস গতি হারিয়ে ফেলেছে তখনও। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প বা ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পেও এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা চলে বায়ুশক্তিকে।

যে পৃথিবীতে জ্বালানী নিয়ে এত হাহাকার তার ভূগর্ভেই কিন্তু সঞ্চিত আছে তাপ শক্তির অতুল ভাণ্ডার। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০,০০০ ফুট বা ৯ কিলোমিটার নীচে পর্যন্ত কূপ খনন করে জল পাঠিয়ে দিলে তা বিনা পাম্পেই অতি উত্তপ্ত বাষ্প হয়ে ভূপৃষ্ঠে উঠে আসবে। এই বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলবে। অবশ্য বাষ্পের সঙ্গে ভূগর্ভ থেকে যেসব সালফাইড জাতীয় গ্যাস নির্গত হবে তাতে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাছাড়া এরকম গভীর খননের প্রযুক্তি আমাদের গ্রামীণ পরিবেশে সম্ভবও নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে যেমন বক্রেশ্বরে গরম জলের প্রাকৃতিক ফোয়ারা আছে —এগুলিও মূলত ভূগর্ভ তাপে উত্তপ্ত। এই তাপশক্তিকে গ্রামীণ শিল্পে ব্যবহার সহজ প্রযুক্তির অন্তর্গত যা গ্রামে চালু করা যায়। আর এক জোড়া সম্ভাব্য জ্বালানী হচ্ছে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (যা জলকে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়)। বায়ু থেকে প্রায় বিনা খরচে উইণ্ড মিল মারফৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হতে পারে। জলের সঞ্চয় তো সীমাহীন। এবার ওই বিদ্যুৎ দিয়ে জলকে বিশ্লেষিত করলে এবারও প্রায় বিনা খরচায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জ্বালানী পাওয়া যাবে। জল ও বায়ু অফুরন্ত বলে এ জ্বালানীও অফুরন্ত। তাছাড়া হাইড্রোজেন দহনের পর জল পুনরায় উপজাত হয়ে ফিরে আসবে মানুষের কাজে। এ প্রযুক্তি অবশ্য এখনও গবেষণার স্তরে। একে অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক বাস্তবের স্তরে নামিয়ে আনতে পারলে বিকল্প জ্বালানীর একটা বড় সমাধান হয়ে যায়। হাইড্রোজেনকে তরল অবস্থায় পাইপের সাহায্যে যানবাহনের ইঞ্জিনে পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

শক্তি সন্ধানে আমাদের শেষ বিকল্প সৌরশক্তি। প্রকৃতপক্ষে সব শক্তির মূলে রয়েছে সৌরশক্তি। কাঠ, কয়লা, তেল বা গ্যাস প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের দাহিকা শক্তি প্রকৃতপক্ষে বহু বৎসরের সঞ্চিত বা আবদ্ধ সৌরশক্তি। জলের জোয়ার ভাঁটা বা বায়ু সঞ্চালনও সৌরশক্তির প্রভাবেই। এমন কি ভূগর্ভ তাপও সূর্যের কাছে ধার করা। অমিত তেজ সূর্যই সৌরমণ্ডলের সর্ব শক্তির উৎস। সূর্যের মোট যে শক্তি চারদিকে বিকিরণ হয়, তার ২০,০০,০০,০০০ ভাগের ১ ভাগ এসে পড়ে পৃথিবীতে। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার আয়তনে যে সৌরশক্তি আছড়ে পড়ে তা ১৩৬০ ওয়াট বিদ্যুতের তুল্যমূল্য। পৃথিবীতে পতিত সৌরশক্তির সবটুকু যদি রূপান্তর করে কাজে লাগানো যেত তা হলে আধঘণ্টার মধ্যে বিশ্বের বাৎসরিক প্রয়োজনের সব শক্তিটুকুর জোগাড় হয়ে যেত। অবশ্য তা সম্ভব নয়। সৌরশক্তির অনেকখানি, পৃথিবীতে পৌছানোর আগেই শোষিত হয়ে যায় আবহমণ্ডলে। তাছাড়া সৌরশক্তিকে প্রয়োজনীয় তাপ, গতি বা শক্তিতে রূপান্তরকরণের দক্ষতা (Efficiency) খুবই কম। সৌরশক্তি পৃথিবীতে পড়ে একান্ত অনিয়মিতভাবে, এক এক ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন মান নিয়ে। ফলে একে সঞ্চয় করে (বৈদ্যুতিক ষ্টোরেজ সেল জাতীয় প্রযুক্তিতে) রাখতে না পারলে ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট হারে তা পাওয়া অসম্ভব।

এতক্ষণ আমরা বিকল্প জ্বালানীর শাস্ত্রগত আলোচনা করলাম যাতে বিশ্বব্যাপী শক্তির উৎস সন্ধানের গুরুত্বটা উপলব্ধি করা যায়। এবার আমরা এর প্রযুক্তিগত দিকটা, বিশেষতঃ সেই সম্ভাবনাগুলি যা অপেক্ষাকৃত সহজে ও সস্তায় গ্রামীণ প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা খতিয়ে দেখব একে একে। আমরা এ পর্যন্ত ৬টি পরিবর্ত শক্তির তথ্যগত আলোচনা করেছি। এর মধ্যে দুটি (১) ভূগর্ভস্থ তাপ এবং (২) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে আমরা প্রযুক্তিগত আলোচনা থেকে বাদ দেব কারণ এগুলি এখনও গবেষণা স্তরেই রয়েছে ও এদের প্রযুক্তি গ্রামীণ অর্থ নৈতিক ও কারিগরী ক্ষমতার বাইরে। বাকি চারটির—(১) জ্বালানী গ্যাস ও অ্যালকোহল, (২) জলশক্তি, (৩) বায়ুশক্তি ও (৪) সৌরশক্তির সহজতর প্রযুক্তিগুলি তুলে ধরা হবে এখানে।

(১) জ্বালানী গ্যাস ও অ্যালকোহল

আগেই দেখা গেছে ভূগর্ভ গ্যাস ও সুরাসার (অ্যালকোহল)-কে পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা গ্রামীণ ক্ষেত্রে খুবই উজ্জ্বল। বাঁকুড়া অঞ্চলে একরকম বাদামী কয়লা পাওয়া যায়, যা আর কাঠ নেই অথচ এখনও

পুরোদস্তর কয়লায় পরিণত হয়নি। কোলকাতার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মৃত্তিকা তলে—ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০/৪০ ফুট নীচে এইরকম পরিবর্তিত সুন্দরী কাঠের স্তর পাওয়া যায় যা এখনও প্রস্তরীভূত হয় নি। যাঁরা বোরিং করেন —ও. এন. জি. সি., জিওলজিক্যাল সার্ভে বা টিউবওয়েল কারিগররা বলতে পারেন এরকম অপরিণত জ্বালানী পশ্চিমবঙ্গের আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে। এই খনিজ জ্বালানীকে সরাসরি পোড়ানোর থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় এ থেকে শুধু যে জ্বালানী গ্যাস মিথানল পাওয়া যেতে পারে তাই নয় সেই সঙ্গে লাইট অয়েল, মিডিল অয়েল, আলকাতরা (Tar) ও অ্যামোনিয়া সালফেটের মত খনিজ রাসায়নিকও পাওয়া যেতে পারে, শিল্পজগতে যার চাহিদা প্রচুর।

এছাড়া আছে নানা রকম আবর্জনা। পশ্চিম জার্মানীতে দেখা গেছে চার সদস্যের এক পরিবারের বাড়ী থেকে যে আবর্জনা বের হয়, আধুনিক পদ্ধতিতে পাতন করে তা থেকে ওই পরিবারের মোট তাপ ও বিদ্যুৎ চাহিদার ২৫ শতাংশ পরিমাণ জ্বালানী (দৈনিক ৪০ লিটার মত) পাওয়া যায়। ইউরোপের মাথা পিছু শক্তি চাহিদা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী (পৃথিবীর গড় মাথা পিছু বার্ষিক ২০৭৪ কেজি কয়লার সমতুল্য; ভারতের গড় মাথা পিছু বার্ষিক ১৭৮ কেজি কয়লার সমতুল্য : ইউরোপের গড় পৃথিবীর গড়ের থেকে অনেক বেশী)। অথচ পারিবারিক আবর্জনার হারে এতটা কমবেশী হয় না। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে পশ্চিম জার্মানীর প্রযুক্তি গ্রহণ করলে ভারতীয় পরিবারে মোট শক্তি চাহিদার সবটুকুই হয়ত পারিবারিক আবর্জনা থেকেই পাওয়া যেতে পারে। আবর্জনা থেকে জ্বালানী সংগ্রহের পদ্ধতিটি বেশ সরলই। নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় ধীর গতি অপূর্ণ দহনে (Partial slow Combustion) আবর্জনাকে তরল ও বায়বীয় জ্বালানীতে পরিবর্তিত করা হয়।

জ্বালানী গ্যাসের আর একটি চমৎকার গ্রামীণ সম্ভাবনা হল বায়োগ্যাস মিথেন)। ভারতে বছরে কমবেশী ৩০০ কোটি টাকার ঘুঁটে পোড়ানো হয় (১৩ কোটি ভারতীয় পরিবারের মধ্যে যদি ধরে নেওয়া যায় ১০ কোটি পরিবার মাসে ৬০ থেকে ৭৫টি ঘুঁটে খরচ করেন উনান ধরাতে, তাহলে এর ন্যূনতম দাম ২·৫০ টাকা ধরলে সর্বভারতীয় বার্ষিক অঙ্কটা ৩০০,০০,০০,০০০, টাকাতেই দাঁড়ায়)। ঘুঁটে হিসাবে এই বিপুল গোময়-সঞ্চয়ের অতি সামান্য

অংশই সু-ব্যবহৃত হয়। এই গোবর বায়োগ্যাস প্ল্যাণ্টে পুরতে পারলে ঘরে ঘরে জ্বালানী মিথেন তো পাওয়া যাবেই, তরল সার কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে বেশ খানিকটা। এই তরল সারে ২% নাইট্রোজেন থাকে এবং সার জৈবিক হওয়ায় দরুণ চট করে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। ২ ঘনমিটার সাইজের বায়োগ্যাস প্ল্যাণ্ট চালাতে যে মল লাগে তা যোগান দিতে পারে ৪টি গরু বা মোষ কিম্বা ৬০ জন মানুষ। একটি ৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন ৮ ঘণ্টা ধরে চালাতে ১৮ থেকে ২০ ঘনমিটার গ্যাস লাগবে। উপযুক্ত পাম্পের সঙ্গে যুক্ত করলে এই ইঞ্জিন ৮ থেকে ১০ একর জমি সেচ করতে পারবে। অর্থাৎ যার দশ একর পর্যন্ত জমি আছে (একলপ্তে হলেই ভাল হয়) তাঁর গোয়ালে যদি ৪০টি গরু থাকে, সেচের ব্যবস্থা তিনি প্রায় বিনা খরচেই করে নিতে পারবেন, যার ফলে তাঁর জমি উচ্চফলনশীল দু-ফসলা চাষের দরুন তাঁকে ২/৩ গুণ আয় করতে সাহায্য করবে। এ অঙ্ক কোন রূপ কথা নয়। দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের হুবলী গাদাদ লাইনে রয়েছে একটি রেল ষ্টেশান—উসাগাল। উসাগাল ষ্টেশানের সমস্ত বাতি আজ জলছে বায়ো গ্যাস বা জৈব গ্যাস দিয়ে। সে জৈব গ্যাস জোগাচ্ছে ষ্টেশান সংলগ্ন ক্ষুদ্র রেল কলোনীর সেপটিক ট্যাঙ্কগুলি। ভারতের রেল ষ্টেশানে জৈব গ্যাসের ব্যবহার এই প্রথম।

দিল্লীর ওখলা সুয়েজ ডিসপোজাল ওয়ার্কসের এক সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রতিদিন ১৬·৩ লাখ লিটার ময়লা থেকে ১৭,০০০ ঘন মিটার গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে যা ৪১,৬১,০০০ লিটার কেরাসিন বাঁচিয়ে দিচ্ছে প্রতি বছর। ৭,০০০ পরিবারের রান্না চলছে এই গ্যাসে। পরিকল্পনা রয়েছে এক বছরের মধ্যে আরো ১০,০০০ বাড়ীতে গ্যাস জোগানোর।

এই বইয়ে দেওয়া তথ্যগুলি থেকে এ অঙ্ক আপনি নিজেই মিলিয়ে নিতে পারবেন। বায়োগ্যাসকে এখনও সিলিণ্ডার জাত করা যায়নি। গেলে এর উৎপাদন দক্ষতা ও ব্যবহারিক সুবিধা আরো অনেক বেড়ে যাবে। বায়ো গ্যাসকে গ্রামীণ শিল্পের কাজেও লাগানো যায়। মাটি বা সেরামিকসের কাজে, সোনা, রূপা বা অন্যান্য সিট মেটালের কাজে, সাবান বা চূণ শিল্পে অথবা ধান সিদ্ধ করতে যে ভাটি বা চুল্লীর দরকার হয়, বায়োগ্যাস তার চমৎকার জ্বালানী হতে পারে। বায়োগ্যাসের ইঞ্জিন দিয়ে জেনারেটার চালিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ কাজে লাগানো যেতে পারে ধান ভানাই বা গম

পেষাই যন্ত্রে, কাঠ শিল্পের চেরাই ছোলাই এর নানান যন্ত্রে। রান্নাঘরে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে (১) বিশেষভাবে তৈরী বায়োগ্যাসের পরিষ্কার বার্ণার লাগিয়ে নিন ষ্টোভে, সিলিণ্ডার জাত বুটেন গ্যাসের বার্ণারটি খুলে রেখে ও (২) ঢাকা আটকানো চওড়া নীচু পাত্রে (যেমন প্রেসার কুকার) ন্যূনতম জল দিয়ে রান্না করুন। অল্প গ্যাসে বেশী কাজ পাবেন। এই গ্যাসে গ্রামের রাস্তায় আলোও দেওয়া যায়।

আখের ছোবড়া, আলুর খোসা, গুড়ের গাদ বা চালের ছাঁটাই (Rice Polish Waste) থেকে উদ্‌গমন বা ফার্মাণ্টেসান (Fermentation) পদ্ধতিতে তৈরী করা যায় অ্যালকোহল বা সুরাসার যার বৈজ্ঞানিক নাম ইথানল (Ethanol)। কৃষি আবর্জনার এই ফার্মাণ্টেসান গ্রামীণ প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অ্যালকোহল পুড়িয়ে যে যন্ত্রশক্তি (Mechanical Power) পাওয়া যায়, পেট্রোল ইঞ্জিনের বা ডিজেল ইঞ্জিনের সামান্য রদবদল করে তা দিয়ে চালানো যেতে পারে ট্র্যাক্টার, পাওয়ার টিলার, মাছ ধরা বা মাল পরিবহনের মোটর বোট, হালকা মোপেড ও অটোরিক্সা। পেট্রোলের ধোঁয়ার তুলনায় অ্যালকোহলে পরিবেশ দূষিত হবে না বল্লেই চলে। আর অ্যালকোহলের শিল্পগত ব্যবহার বিশেষতঃ খাদ্য, বস্ত্র, রসায়ন, ওষুধ ও রেয়ন শিল্পে তো অসংখ্য। আগামী ১৮ বছরে সুরাসারের চাহিদা ৪০ গুণ বেড়ে যাবে।

(২) জলশক্তি ও (৩) বায়ুশক্তি

এই দুই শক্তির উপযুক্ত মিশ্রণে চমৎকার সব গ্রামীণ প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। তার এক নম্বর হচ্ছে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প। ৯৬ পৃষ্ঠায় ৮নং চিত্রে দেখুন, সোনারপুরের আড়াপাঁচ গ্রামে রামকৃষ্ণমিশন বসিয়েছেন আধুনিক উইণ্ডমিল। বায়ু বেগে উইণ্ডমিলের পাখা ঘুরতে থাকলে মিলের গোড়ায় বসানো পাম্প পুকুর থেকে জল তুলে চালান দেয় ওভারহেড ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে ভালভ খুলে ইচ্ছেমত জল পাওয়া যায় যখন তখন। এঁরা অবশ্য এই জল ব্যবহার করেন সেচের উদ্দেশ্যে। তবে বড় মাপের ট্যাঙ্ক থাকলে পাইপের মারফৎ এ জল গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে সরবরাহও করা যায়। উঁচুতে তোলা জল নামার মুখে টারবাইন বসিয়ে দিলে জলের তোড়ে চালিত টারবাইন বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। অবশ্য এ প্রযুক্তি এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে জলের তোড়ে সরাসরি চালানো যেতে পারে খড়কাটা মেসিন, গম পেষাই যাঁতা, ঘানি, লিমপো কারখানার বেলচাকি (চূণ-পেষবার যন্ত্র), গ্রামীণ ছাপাখানা, ওয়াশিং মেসিন, শিল্পগারের কনভেয়ার বেল্ট, অষুধ শিল্পের যান্ত্রিক উদ্খল ও ফলের রস নিষ্কাশনী প্রেস, মৌ শিল্পের হানি একসট্রাক্টার, আইসক্রীম চারনার ও ঘি তৈরী করবার দুধ মোয়া কাঠি।

যে সব শিল্পে বাতাসের বা বাষ্পের পরিচলন দরকার হয়, সেখানে এয়ার ব্লোয়ার (AIR BLOWER) ও চালানো যেতে পারে জলের তোড়ে। এই সব যন্ত্রের বেশীর ভাগই এখন চলে বৈদ্যুতিক মোটরের বা রোটরের (Rotar) সাহায্যে। জলশক্তি দিয়ে চালাতে হলে এই সব যন্ত্রের মুখ্য-চালক' (Prime Mover) এর সঙ্গে ইমপেলার বা জল-তাড়িত-পাখনা যুক্ত করে দিতে হবে যেমন থাকে পাম্পে। ইমপেলার ও মূলযন্ত্রের গতিবেগের তারতম্য থাকবেই। তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হবে নির্দিষ্ট সংখ্যক গীয়ার হুইল (বেগ ধারক / বর্ধক চক্র) ফিট করে। শুনতে কিছুটা গোলমেলে লাগলেও আসল প্রযুক্তিটা কিন্তু নেহৎই সরল।

বায়ু শক্তির মূল হল বায়ু বেগের ধারণ। নৌকা বা সাবেকী জাহাজে এই বেগ ধারণের কাজ করা হয় মাস্তুলে খাটানো কাপড়ের পালের মারফৎ। উইণ্ড মিলে বা বায়ুকলে এই বেগ ধারণের কাজ করে কলের পাখাটি তার চওড়া চওড়া ব্লেড বা পাখনার মারফৎ। উইণ্ড মিলের শক্তি-উৎপাদন দক্ষতা বা Efficiency হচ্ছে ৪০ শতাংশ। জন্মস্থান হল্যাণ্ড। ১২৭৪ খৃঃ এ হারলেমে, ১৩৩৬ খৃঃ এ আমস্টারডামে ও ১৩৯৭ এ উট্রেচে প্রথম বায়ুকল বসানো হয়। এই সব বায়ুকলে তিন রকম গ্রামীণ কাজ হত : বর্ষার দিনে বন্যারোধে জল নিষ্কাশন ও গ্রীষ্মে শস্য মাড়াই ও কাঠচেরাই। বেশীরভাগ বায়ুকলের পাখা ও কলকব্জা তৈরী হত কাঠের। কোন কোন উইণ্ডমিলের পাখা সমেত মাথাটি ঘোরানো যেত হাওয়ার গতি অনুযায়ী। গঠন ভেদে নানান জাতের উইণ্ডমিল ছিল হল্যাণ্ডে—পোষ্ট মিল, উইপ মিল, ক্যাপওয়াইণ্ডার, ষ্টেজ বা টাওয়ার মিল, বেল্টমোলেন, পালট্রোকমোলেন ইত্যাদি। আধুনিক মিলেও উপরোক্ত সব কাজই হতে পারে এবং অনেক হালকা বলে আধুনিক মিলের কর্মদক্ষতা অনেক বেশী। সাধারণতঃ জাপানী ডিজাইনে তৈরী আধুনিক বায়ুকলে পাখার চারটি কাঠ বা চামড়ার তৈরী বাহুর বদলে ১০টি থেকে ১৬টি অ্যালুমিনিয়ামের বা জলরোধক প্লাই উডের পাখনা থাকে (৮নং চিত্র)।

এই পাখনা বা ডানাগুলি বাঁশের বাঁকারী বা কঞ্চির ফ্রেমে তালপাতা বা ঘন বুনট হালকা ও পাতলা দরমা এঁটেও করা যায়। মিলের ভিতরে যে নাইলন বা রবারের বেল্ট দিয়ে নীচের পাম্পকে ঘোরানো হয়, তা নারকেল কাতা (দড়ি) দিয়ে বুনেও করা চলে। তাতে মিলের দাম অনেক কমে যাবে। অথচ গুণগত উৎকর্ষতা কমবে না। বায়ুপ্রবাহ দ্বিগুণ হলে বায়ু কলের শক্তি উৎপাদন আটগুণ বাড়ে। বাতাসের দশ কিলোমিটার বেগে যে কল ১ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ দেয় বিশ কিলোমিটার বায়ুবেগে সেই কল ৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ দেবে। তাই উইণ্ডমিলের সাফল্য নির্ভর করে বেগবান বায়ুপ্রবাহের উপর।

(৪) সৌরশক্তি

সাইরাকিউজের সমুদ্রোপকুলে প্রহরীরা সেদিন আর্তনাদ করে উঠল—গ্রীস আক্রান্ত। ভয়ানক পরাক্রান্ত রোমান সৈন্যের দল অসংখ্য পালতোলা জাহাজে ভীমবেগে ধেয়ে আসছে গ্রীসের দিকে: সংখ্যায় নাকি তারা অগুনতি। ছোট্ট গ্রীসের ক্ষুদ্রতর বাহিনী তাদের ফুৎকারেই উড়ে যাবে। গ্রীক সম্রাট হীরণ ডেকে পাঠালেন দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ আর্কিমিডিসকে। দেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব সঁপে দিলেন তাঁকে। আর্কিমিডিসের আদেশে রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্রতীরে বসানো হল শত শত বিরাট বিরাট আয়না। শত্রু-পক্ষের কাঠের জাহাজগুলি সমুদ্রবক্ষে দেখা দিতেই আর্কিমিডিসের নির্দেশে সৈন্যরা আয়নাগুলিকে ঘুরিয়ে প্রতিফলিত সূর্যালোক ফেলতে লাগল ওই সব জাহাজের বুকে। অসংখ্য আয়নায় প্রতিফলিত সৌরশক্তি যেই কেন্দ্রীভূত হল জাহাজের গায়ে, সেই প্রচণ্ড উত্তাপে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। হতবুদ্ধি শত্রুবাহিনী কিছু বোঝার আগেই জলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। এই বোধহয় মানুষের প্রথম সৌরশক্তির ব্যবহার! না, আবহমান কাল ধরে মানুষ কাপড় বা কাঁচা ইট শুখাতে, আচার বা ফল রৌদ্রালোকে জীবাণুশূন্য করতে অথবা কৃষিকাজের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আসছে নিজের সেবায়। গ্রামের উন্মুক্ত ও নির্জন পরিবেশ সৌরশক্তি ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ।

এখন পর্যন্ত আমরা যে সব প্রযুক্তিগত কৌশল আয়ত্ব করতে পেরেছি তাতে সৌরশক্তিকে তাপ ও বিদ্যুৎ শক্তিতে এবং নিম্নহারের দক্ষতায়

(২-৩ শতাংশ) চাপ শক্তিতে পরিণত করা যায়। সরাসরি সৌরশক্তিকে সঞ্চিত করা যায় না। তেল বা প্রস্তরখণ্ডে সাময়িকভাবে সৌরতাপ সঞ্চয় করা, সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করে তা ষ্টোরেজ ব্যাটারীতে জমানো বা সৌরশক্তি চালিত পাম্পে জল উঁচুতে তুলে রেখে প্রয়োজনমত কাজে লাগানো —সৌরশক্তি সঞ্চয়ের আপাত আবিষ্কৃত এই ক'টিই পদ্ধতি যাতে শক্তির একটা মোটা অংশ খরচ হয়ে যায় সঞ্চয়ের কাজে। ফলে সামগ্রিক উৎপাদন দক্ষতার হার নেবে আসে অনেকটা। তবু বিকল্প জ্বালানী হিসাবে সৌরশক্তির মূল্য অনেক। কারণ পৃথিবীর সর্বত্র অঢেল, অফুরন্ত ভাবে পাওয়া যায় এ শক্তি—একেবারে বিনা ব্যয়ে। বিশেষতঃ বিষুবরেখীয় (Tropical) অঞ্চলে, যার মধ্যে ভারত অন্যতম। তাই ভারত সরকার খুবই জোর দিচ্ছেন সৌর-শক্তিকে বিকল্প জ্বালানী হিসাবে কাজে লাগাবার জন্য। প্রতি রাজ্যে স্থাপন করা হচ্ছে সৌরতাপ কেন্দ্র।

সাধারণতঃ সৌরতাপ সংগ্রহ করে সেই তাপ ব্যবহারের জন্য সংগ্রাহক (Collector) হিসাবে ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়াম বা তামার কালো রং করা পাত। এ পাত এক বা একাধিক হতে পারে—ভাঁজ করা (Folded), সমান্তরাল, পেঁচানো টিউবাকৃতি (Coil) বা ঢেউ খেলানো (Corrugated)। শেষেরটি ৩১নং নকশার সূর্যমুখী তাপগ্রাহক যন্ত্রের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

১৯৩২ সালে টিসকোর রসায়ন-বিদ ও প্রয়াতরাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাজনৈতিক সহকর্মী শ্রীমণি ঘোষ ভারতের এবং খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম সৌরচুল্লীটির সফল পরীক্ষা করেছিলেন তাঁর জামশেদপুরের বাসার উঠানে। চুল্লীটির গঠন শৈলী এই রকম : যে দিক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে সে দিকে থাকে একটি কাঁচের আস্তরণ যার মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে কিন্তু তাপ রশ্মি বেরিয়ে যেতে পারে না (Green House Effect)। বাকি পাঁচটি দিকে (তলায় ও চারধারে) থাকে থার্মোকোল, থার্মোফ্রিজ, গ্লাস উল, কাঠ গুঁড়ো বা অ্যাসবেষ্টস ফাইবার জাতীয় কোন তাপরোধক আস্তরণ। বিকল্প ব্যবস্থায় পালিশ করা চকচকে ধাতব প্লেটের উপর নিকেল অক্সাইড বা সালফাইডের কালো আবরণ দিয়ে তাপ সংগ্রহ করা হয়। কালো আবরণের উচ্চ গ্রহণ ক্ষমতা ও পালিশ করা উজ্জ্বল তলদেশের অতি ক্ষীণ বিকিরণ ক্ষমতার দরুণ এজাতীয় সংগ্রাহকের দক্ষতা বেশী।

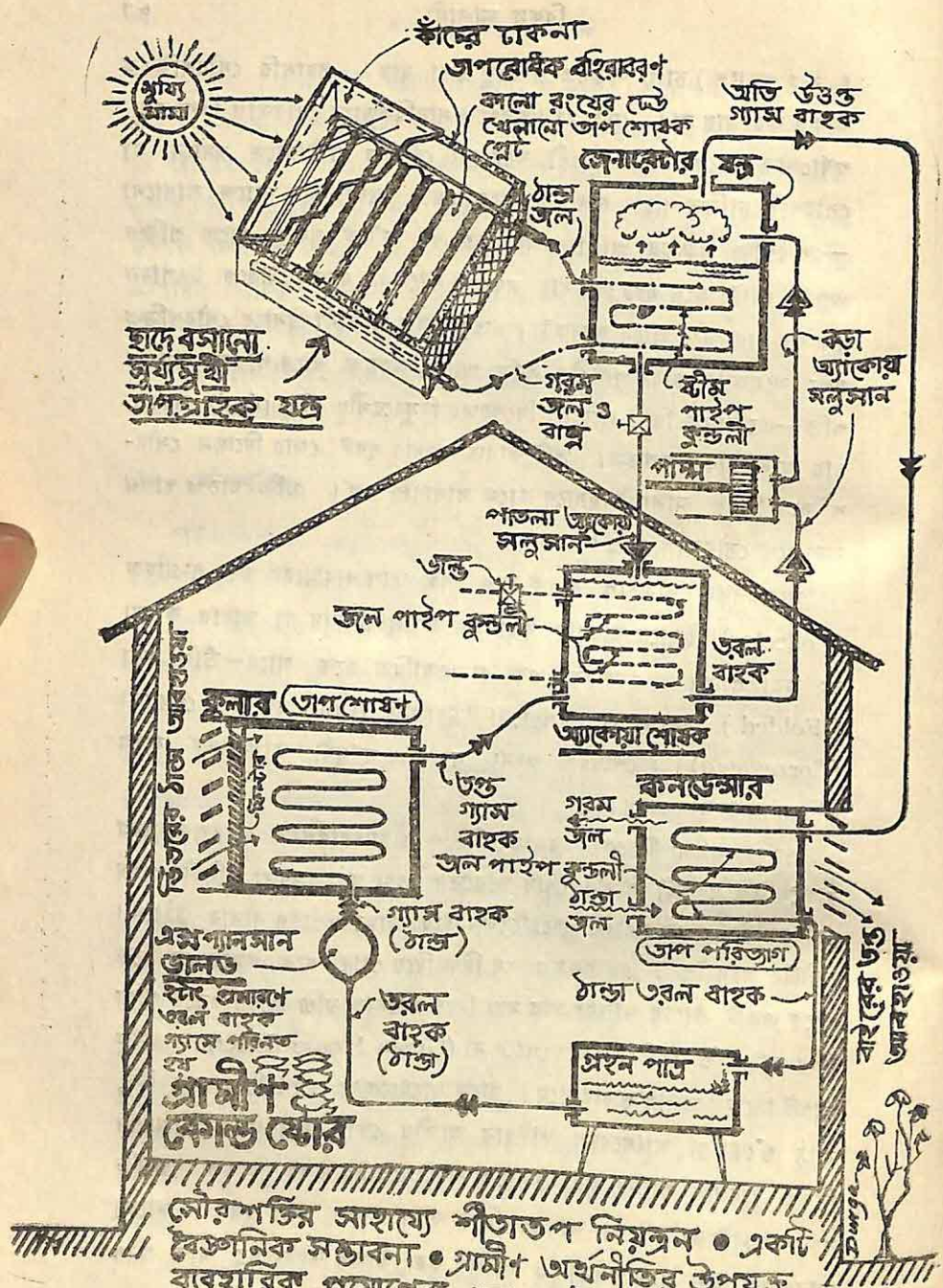

সৌরশক্তির সাহায্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন • একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা • গ্রামীণ অর্থনীতির উপযুক্ত ব্যবহারিক প্রয়োগের খুব একটা দেরি হবে না॥

৩১নং নকশা

সংগৃহীত তাপকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় বাতাস বা অ্যামোনিয়া জাতীয় গ্যাস বা জল বা তেল জাতীয় কোন তরল পরিবহক। এবার এই তাপকে জমা রাখার পালা। গ্যাস পরিবহনে উত্তপ্ত গ্যাস একটি তাপরোধক আস্তরণ দেওয়া কংক্রিটের বাক্সের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই বাক্সে ১"-৪" মাপের পাথরের নুড়ি ভর্তি থাকে যা জমা

৩২নং নকশা

রাখে তাপকে। এক বর্গফুট সাইজের সংগ্রাহক থেকে পাওয়া তাপ জমা রাখতে ১৫০ থেকে ২০০ কেজি পাথরের নুড়ি প্রয়োজন। তরল পরিবহনে একটি তাপরোধক আস্তরণ দেয়া জলের ট্যাঙ্ক (৩১ নং নকশায় যাকে বলা হয়েছে জেনারেটার যন্ত্র)। এই ট্যাঙ্কের ভিতর যে পাইপ কুণ্ডলী আছে তার মধ্যে দিয়ে গরম পরিবহক তরলকে চালালে সংগৃহীত তাপ চালান হয়ে যায় ট্যাঙ্কের জল বা তেলে। এরপর প্রয়োজন মত কাজে লাগানো হয় সেই তাপকে…জল বা ঘর গরম করা, রান্না প্রভৃতি কাজে। এই তাপ

দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের (৩১ নং নক্‌শা) এক বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আছে। তবে এ নিয়ে ব্যবহারিক প্রযুক্তি এখনো গড়ে ওঠে নি। উঠলে গ্রামীণ কোল্ড ষ্টোরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। লেন্‌স্ বা প্যারাবোলিক প্রতিফলক দিয়ে (৩২ নং নক্‌শা) তাপ কেন্দ্রীভূত করার পদ্ধতি বেশ প্রাচীন। চার ফুট ব্যাসের লেন্‌স বা অ্যালুমিনিয়ামের প্যারাবোলিক প্রতিফলিক দিয়ে ঘণ্টায় এক গ্যালন জল ফোটানো যায়। এইভাবে ফ্রান্সে ৪০০০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কেন্দ্রীভূত তাপ দিয়ে রান্না বা শিল্পকর্মের উপযুক্ত সৌর চুল্লী (Solar Oven বা Solar Boiler) তৈরীর প্রাথমিক প্রযুক্তি ৩২ ও ৩৩ নং নকশায় দেখানো হল। এই চুল্লীর প্রাথমিক খরচ বেশ মোটা রকমের হলেও কাঁচামাল ও মেরামতি বাবদ দৈনন্দিন খরচ না থাকায় এ ধরনের চুল্লীর গ্রামীণ প্রসার কাম্য। তবে

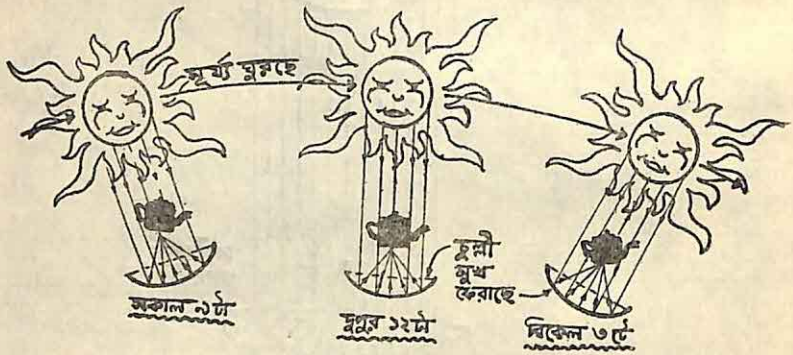

৩৩নং নকশা

তাপ সংগ্রহ করে রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকায় আকাশে সূর্য না থাকলে বা মেঘে ঢাকা থাকলে এ চুল্লী অচল। বর্তমানে বাজারে যে সব সোলার ওভেন পাওয়া যাচ্ছে তার ন্যূনতম দাম ৩০০·০০ টাকা—গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে খুবই বেশী। এই প্রয়োজন মেটাতে এগিয়ে এসেছেন দিল্লী আই. আই. টির 'গ্রাম গঠন ও সঠিক প্রযুক্তি কেন্দ্র'। তাঁদের উদ্ভাবিত কার্ডবোর্ডের বাক্সে তৈরী সৌরচুল্লীর দাম পড়ছে ২০·০০ টাকার মত। অশিক্ষিত গ্রামীণ মহিলারা নিজেরাই তৈরী করতে পারবেন এই চুল্লী যা এক ঘণ্টার মধ্যে নিখরচায় জোগাবে ১১০° সেন্টিগ্রেড তাপ···অনায়াসে রাঁধা যাবে ভাত, ডাল, তরকারী।

ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে সিলিকনযুক্ত ফটো ভোল্টাইক সেল। সেলের আবরণে পতিত সূর্যালোক থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এই বিদ্যুৎকে সহজেই এবং দীর্ঘসময়ের জন্য জমা করে রাখা যায় ষ্টোরেজ ব্যাটারীতে (যে ব্যাটারী ব্যবহার করা হয় মোটর গাড়ীতে)। ফটো সেল দিয়ে এতদিন চালান হত সৌর ঘড়ি, থার্মোমিটার, ক্যালকুলেটার ইত্যাদি ছোটখাট যন্ত্র। ইদানীং বড়দরের কাজও সম্ভব হয়েছে। দিল্লীর শাহিবাবাদে অবস্থিত ভারত সরকারের সি. ই. এল (Central Electronics Ltd.) একগোছা সিলিকন সৌরকোষ দিয়ে তৈরী করেছেন ফটো ভোল্টাইক মডিউল যাকে এক ধরনের ইলেকট্রনিক চক্ষু বলা চলে। ঠিক এই ধরণের চক্ষু দিয়ে কাজ করে ক্যামেরার এক্সপোজার মিটার। এই মডিউলের উপর রোদ পড়লে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৮০ ওয়াটের মত যা তিন কামরার বাড়ীকে আলোকিত করতে বা পাম্প চালিয়ে ঘণ্টায় ১৫০০ লিটার জল ১২ ফুট নীচে থেকে তুলে দিতে সক্ষম। এই শক্তিকে মোটর গাড়ীর সাধারণ একজোড়া ব্যাটারীর মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা যাবে ও প্রয়োজন মত রাতবিরেতে ব্যবহার করা চলবে ছোট একটি ইনভার্টারের মারফৎ।

ফটো ভোল্টাইক সেলের দাম এখন ১০০ টাকা মত। সরকার আশা করেন সেলে ব্যবহারযোগ্য বিশুদ্ধ সিলিকন (যা এখন আমদানী করতে হয়) আগামী ৫ বছরের মধ্যে দেশে উৎপাদন করা যাবে এবং সেলের দাম ৪০০০ থেকে ৬০০০ টাকার মধ্যে নামিয়ে আনা যাবে। ইনভার্টার ও ব্যাটারী সমেত পুরো যান্ত্রিক ব্যবস্থাটার বর্তমান প্রাথমিক খরচ পাঁচ হাজার টাকা মত। কাঁচা মাল বলতে লাগে কেবল ব্যাটারীতে দেবার পরিশুদ্ধ জল (Distilled water)— এক বোতলের (এক মাসের খোরাক) দাম দু টাকা। এই ধরনের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের দক্ষতা ১০শতাংশ।

গ্রামীণ প্রযুক্তির পক্ষে চিত্রটি খুবই উৎসাহজনক এবং সরকারও এ ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছেন। সৌরালোক থেকে বিদ্যুৎ, সেই বিদ্যুৎ থেকে পাম্প চালিয়ে নলকূপের জল, সেই জল দিয়ে সেচ করে দু-ফসলা কৃষি: সিলিকন সেল গ্রামীণ ধন সম্বলের চেহারাটা পাল্টে দিতে পারে। সৌরশক্তির এই জৈব রূপান্তরের ভিন্নতর পথ ধরে গবেষণা ভাদোদরের জ্যোতি লিমিটেডেও চলছে। চলছে উড়িষ্যার গঞ্জাম ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজেও। ভারতের কোণায় কোণায়। পাকিস্থানের নোবেল বিজ্ঞানী আবদুস সালাম বলেছেন ২০০০ খৃষ্টাব্দে ভারত

বিশ্বের তিন বিজ্ঞান-অগ্রসর দেশের একটি হয়ে উঠবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে এ সাফল্য যাতে গবেষণাগারের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে না থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে—ভারতের প্রতিটি গ্রামে, গঞ্জে, হাটে, বাজারে।

এই সব বিকল্প জ্বালানী যা নিয়ে পৃথিবীব্যাপী চলছে চিন্তা-ভাবনা তা ছাড়াও দৃষ্টির আড়ালে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত অবস্থায় বিস্তৃততর গ্রামীণ ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে আর এক জ্বালানী— চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় যার ব্যবহার যথাক্রমে ১৯৮৫০, ১১৬৮০ ও ২১৬২০ মিলিয়ান টন কয়লা থেকে প্রাপ্ত শক্তির সমতুল্য। এই সব দেশে অন্যান্য শক্তির ব্যবহার সম্ভাবনা :

	কয়লা	পেট্রোল	প্রাকৃতিক গ্যাস	জল বিদ্যুৎ
চীন	৭,১৯,০০০	১৭,৩০০	২৬,৫০০	১৮,০০০
ভারত	৮৫,৮০০	৩,০০০	৯,৮০১	৭৩০
ইন্দোনেশিয়া	২,৫২০	২,৩০০	—	৪১০

উপরের সংখ্যাগুলি মিলিয়ান টন কয়লা উদ্ভূত শক্তির সমতুল্য। তুলনা করলে বোঝা যায় এই দৃষ্টির আড়ালে ছড়িয়ে থাকা শক্তিটি কত শক্তিশালী। এটি আর কিছুই নয়, গ্রামীণ গরীবমানুষের উনুনের জ্বালানী খড়-কুটো-শুকনো পাতা! বর্তমান ভারতে জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়লা ২৮%, তেল ৬%, গোবর ৩২% ও খড়-কুটো পাতা ৩৪% অংশ জুড়ে রয়েছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে খড়-কুটো-পাতা। উপরের তিনটি দেশে এই জনতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ। এ ব্যাপারে একটা বড় সাবধানতা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। জ্বালানী হিসাবে খড়-কুটো-পাতার ব্যবহার লাগাম ছাড়া ভাবে বেড়ে উঠলে (সম্ভাবনা আছে খুবই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল দিয়ে দাম বেড়ে চলছে অন্যান্য সব জ্বালানীর অথচ খড়-কুটো-পাতা শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে আজও।) বন সম্পদ ধ্বংস হয়ে আবহাওয়া হয়ে উঠবে খরতর ; বাড়বে অনাবৃষ্টি, বন্যার প্রকোপ, মরু অঞ্চল ও বায়ু দূষণ।

যে সব গাছের পাতার ধূলিকণা সংগ্রহের ক্ষমতা অধিক (নীচে তাদের তালিকা ও পাতার দুপিঠ মিলিয়ে বর্গমিটারে কত গ্রাম ধুলো জমে তা দেওয়া হল) সে সব গাছ কাটা নিষিদ্ধ করা উচিত। তাতে পরিবেশ স্নিগ্ধ থাকবে। (সেন্টার ফর ষ্টাডি অফ ম্যান অ্যাণ্ড এনভিরনমেণ্টের সমীক্ষায় প্রকাশ পশ্চিম বাংলার কলকারখানার ধোঁয়া দুশ মাইল দূরের দীঘাতেও হানা দিয়েছে বৃক্ষ-স্বল্পতার দরুণ—অথচ শাল বনে ঘেরা কাছের ঝাড়গ্রামের আবহাওয়াকে কাবু করতে পারেনি ততটা)।

শাল—২·২৫	অর্জুন—২·২৫	কাঞ্চন—১·৯৬
সেগুন—২·৬৮	জারুল—২·০২	অশোক—১·৮৯

এই সঙ্গে আর একটি নতুন প্রযুক্তিগত গবেষণাকে কাজে লাগাতে হবে। আই. আই. টি. (Indian Institute of Technology) চালের ভূষি, শুকনো পাতা, কাঠের গুঁড়ো, শুকনো ঘাস ও খড়কে কাঠকয়লায় পরিণত করে তার সঙ্গে কাদামাটি মিশিয়ে গৃহস্থের রান্নাঘরের জন্য এক নতুন ধোঁয়াবিহীন গুল তৈরী করেছেন। প্রযুক্তি খুবই সাদামাটা। গ্রামদেশে এই গুল চালু করতে পারলে খড়-কুটো পাতা সংগ্রহের তাগিদে গাছ কাটা, পাতা ছাঁটাই-এর আগ্রহ অনেকটাই কমে যাবে।

বিভিন্ন জ্বালানীর তুলনামূলক শক্তিগত মান ঃ

জ্বালানী	পরিমাণ	১ ঘনমিটার বায়োগ্যাসের তুলনায়	১ লিটার কেরোসিনের তুলনায়	১ কিলোওয়াট বিদ্যুতের তুলনায়
বায়োগ্যাস	এক ঘনমিটার	১	১·৬১৩	০·২১৩
কেরোসিন	এক লিটার	০·৬২০	১	০·১৩২
খড়-কুটো-পাতা	এক কেজি	৩·৪৭৪	৫·৬০৩	০·৭৪০
ঘুঁটে	ঐ	১২·২৯৬	১৯·৮৩০	২·৬১৭
কাঠ কয়লা	ঐ	১·৪৫৮	২·৩৫১	০·৩১০
প্রাকৃতিক গ্যাস(বুটেন)	ঐ	০·৪৩৩	০·৬৯৯	০·০৯২
কয়লা	ঐ	১·৬০৫	২·৫৮৯	০·৩৪২
বিদ্যুৎ	এক কিলো-ওয়াট	৪·৬৯৮	৭·৫৭৬	১

কে. ভি. আই. সি. (Khadi & Village Industries Commission) বিভিন্ন গ্রামীণ জ্বালানী নিয়ে একটা তুলনামূলক সমীক্ষা করেছিলেন।

উপরের এই চার্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে দুটি গ্রামীণ জ্বালানীর (খড়-কুটো-পাতা এবং ঘুঁটে) ব্যবহার আমরা পরিবেশ বা কৃষিগত কারণে কমাতে চাই জ্বালানী হিসাবে তাদের মানই উচ্চতম এবং সহজলভ্য ; সুলভও বটে। স্বভাবতই গ্রাম্য-মানুষ এদুটিকে আঁকড়ে থাকতে চাইবেন। বিকল্প জ্বালানীর প্রচলন বেশ শক্ত কাজ হবে। তবু গ্রাম পুনর্গঠনকারীদের লেগে থাকতেই হবে যাতে একদিন গ্রামবাসীদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়।

৬

কুটির শিল্প

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিসো জহি॥

মানুষের এই নিরন্তর প্রার্থনার শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী—যশ, লক্ষ্মী, জয়, বিদ্বেষ নাশ এবং অংশতঃ বিদ্যাও লভ্য হয়ে ওঠে ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। আপ্তবাক্য বলে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, রাজকার্যে অর্ধেক এবং কৃষিকার্যে চৌথা। গ্রামীণ সমাজে লক্ষ্মীর আসন পাকাপাকি ভাবে পাতাতে হলে কৃষিকার্যের পঁচিশ শতাংশ নিয়ে তুষ্ট থাকলে চলবে না; বাণিজ্যে (এক্ষেত্রে শিল্পে) উদ্যোগী হতে হবে।

গ্রামীণ শিল্প নির্বাচনে তিনটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে—(১) এমন শিল্প নির্বাচন করতে হবে যাতে জ্বালানীর ব্যবহার নেই বা ন্যূনতম। এতে যে শুধু জ্বালানী বাঁচবে তাই নয়, উৎপাদন ব্যয় কমে বিক্রয় মূল্যও কমাবে; (২) এমন শিল্প নির্বাচন করতে হবে যার অন্ততঃ প্রধান প্রধান কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিচার করেই বাছতে হবে শিল্প। এতে পরিবহণ ব্যয় কমে শিল্প সম্ভারের মূল্য কমাবে এবং (৩) এমন শিল্প নির্বাচন করতে হবে যাতে হস্ত শক্তি (Elbow power) বা কায়িক শ্রম (Man power)-এর প্রয়োজন সমাধিক। এতে বেশী মানুষের কাজ জুটবে, বেকারী কমবে, শিল্পার্জিত ধনের সুসম ও সুদূর প্রসারী বণ্টন বাড়বে।

কে. ভি. আই. সি. (Khadi & Village Industries Commission) ১৯৬১ সালে এক দেশব্যাপী সমীক্ষা করে এই ধরনের যে সব শিল্পকে গ্রামীণ শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে সিল্ক খাদি ও পশম খাদি, সুতি খাদি, ঘানির তেল ও সাবান শিল্প, হস্ত-প্রস্তুত কাগজ শিল্প, মৃৎশিল্প ও সেরামিকস, মৌমাছি পালন, শস্য ভানাই ও পেষাই উদ্যোগ, তালগুড় শিল্প, দেশলাই প্রস্তুত, চুন শিল্প ইত্যাদি।

আমরা অবশ্য এই অধ্যায়ে যে প্রযুক্তিভিত্তিক আলোচনা করব তাতে এ তালিকা থেকে বাদ যাবে জৈব, বনজ ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পমালা যেগুলি আলোচিত হবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। সেই সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হবে

আরো কিছু শিল্প যা আমাদের পূর্বোল্লিখিত তিন দফা নির্বাচনী চাহিদা মেটায় এবং গ্রাম্য পরিবেশে যার শৈল্পিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল। লক্ষ্ণৌর প্ল্যানিং অ্যাণ্ড একশান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডিজাইন করা ছোট মাপের চিনিকল গ্রামীণ ক্ষেত্রে দারুণ সফল হয়েছে। এতে শ্রমিক লাগে বেশী, মূলধন কম। উৎপন্ন চিনির মান উৎকৃষ্ট অথচ উৎপাদন—খরচ পড়ে কম। এই রকম ভার্টিকাল ফারনেস বা লম্বমান চুল্লী যুক্ত ছোট সিমেণ্ট কারখানাও (দৈনিক উৎপাদন ৪০/৫০ টন) গ্রামীণ প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য। এতেও উৎপাদনের খরচ খুবই কম।

যেহেতু আমরা বাছাই করছি এমন সব শিল্প যাতে প্রয়োজন হবে বহু মানুষের কর্ম সহায়তা, কর্মীদের সূক্ষ্ম কর্মদক্ষতা লাভের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ খুব একটা সামগ্রিকভাবে দেওয়া সম্ভব হবে না এবং এক্ষেত্রে উৎপাদন-প্রযুক্তি যত সরল হয় ততই ভালো। জ্বালানী এড়াবার আর একটা কারণ এসব শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে অজ পাড়াগাঁর বসতিতে। গেঁয়ো মানুষ আসবে না শিল্পাঞ্চলে, শিল্পকে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে ; এমন গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ, কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল পাওয়া শক্ত হবে।

এই সব শিল্প প্রকল্পের আর একটা বড় দিক হবে শিল্প সমবায় যার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ধন সম্বলের অধ্যায়ে। এই ধরণের সমবায় ছোট বড় সব গ্রামীণ শিল্প ক্ষেত্রেই গড়ে উঠতে পারে। যেমন ধরুন ছোট আকারের দেশলাই শিল্প (১৫/২০ জন কর্মী), চক বা মোমবাতি শিল্প (৫/৭ জন কর্মী), সাবান বা মৃৎশিল্পের টেরাকোটা ও আর্দেন ওয়্যার ইউনিট (৪/৫ জন কর্মী) আকারে যা তাতে পারিবারিক শিল্প হয়ে উঠতে পারে। পারিবারিক শিল্পে কর্মীদের যে নিষ্ঠা, কাজের ও উৎপাদনের মান পাওয়া যায়, বড় শিল্পের মাইনে পাওয়া শ্রমিকদের কাছে তা পাওয়া অসম্ভব। সেদিক দিয়ে পারিবারিক শিল্প সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই মাপের ইউনিটের পক্ষে কাঁচামাল আমদানী ও শিল্প সম্ভারের সুষ্ঠ বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা শক্ত। এই মাপের ২০, ৪০ বা ৬০টি ইউনিট নিয়ে সমবায় গড়ে তুললে এই সব সমস্যার সহজতর সমাধান হতে পারে।

বেকারী ঘোচাতে বড় বড় নাগরিক শিল্পের যতটুকু ক্ষমতা, দেশ আজ তার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। তবু পাল্লা দিয়ে ওঠা যাচ্ছে না ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার সঙ্গে। বড় শিল্পে অর্থ নৈতিক তাগিদেই অটোমেশান

১নং চিত্র—স্থানীয় যুবসংঘের যান্ত্রিক লাঙ্গল স্বল্পমূল্যে ভাড়া নিয়ে চাষ করছেন ২৪ পরগণার উকিলিয়া গ্রামের প্রান্তিক চাষী। দেশে আজ যান্ত্রিক লাঙ্গলের সংখ্যা এক লক্ষ

২নং চিত্র—রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আশ্রমস্থ গোশালায় তৈরী হচ্ছে জনতা বায়ো গ্যাস প্লান্ট।

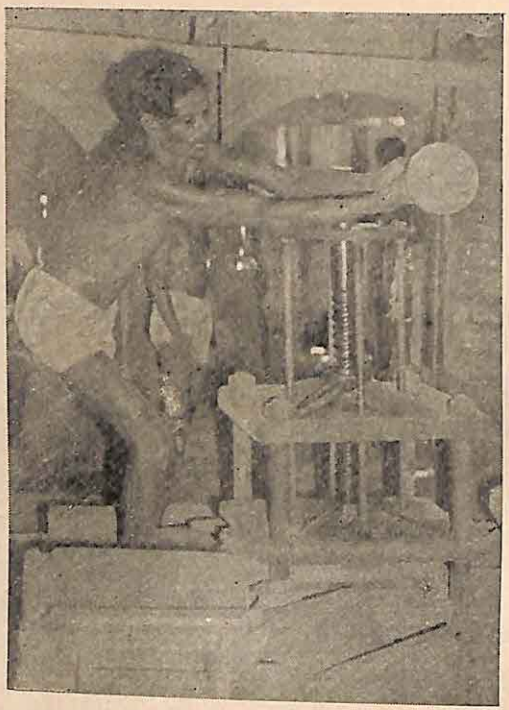

২নং চিত্র—আনারপুর সবুজ সংঘের উদ্যোগে মেদিনীপুরের কুকরাহাটিতে হচ্ছে মাটির টালি···মেসিন প্রেসে।

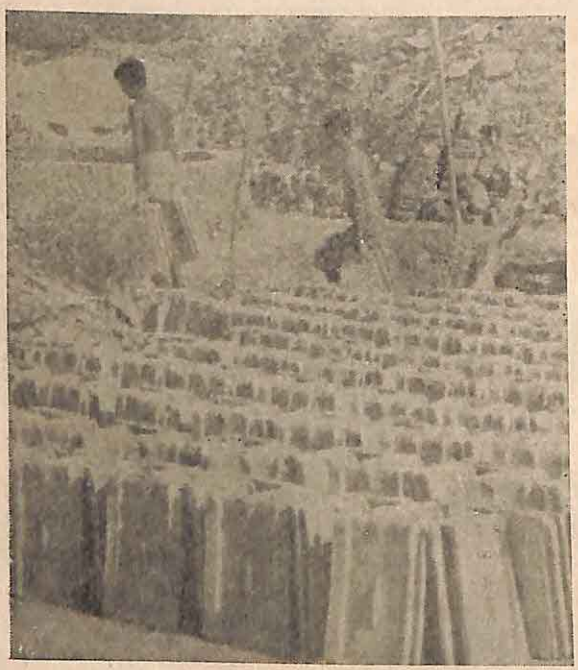

৩নং চিত্র—প্রেসে তৈরী মাটির টালি রোদে শুকাচ্ছে, কুকরাহাটি, মেদিনীপুর। ছেলেরা প্রতি দফায় ৪ খানা করে টালি বইছে।

৪নং চিত্র—ধর্মগোলার অংশীদার সভায় ঋণ গ্রহীতা বীজধানের দাবী জানাচ্ছেন।
স্থান মেদিনীপুরের মহিষাদল ব্লকের ডিহি গুমাই গ্রাম।

৫নং চিত্র

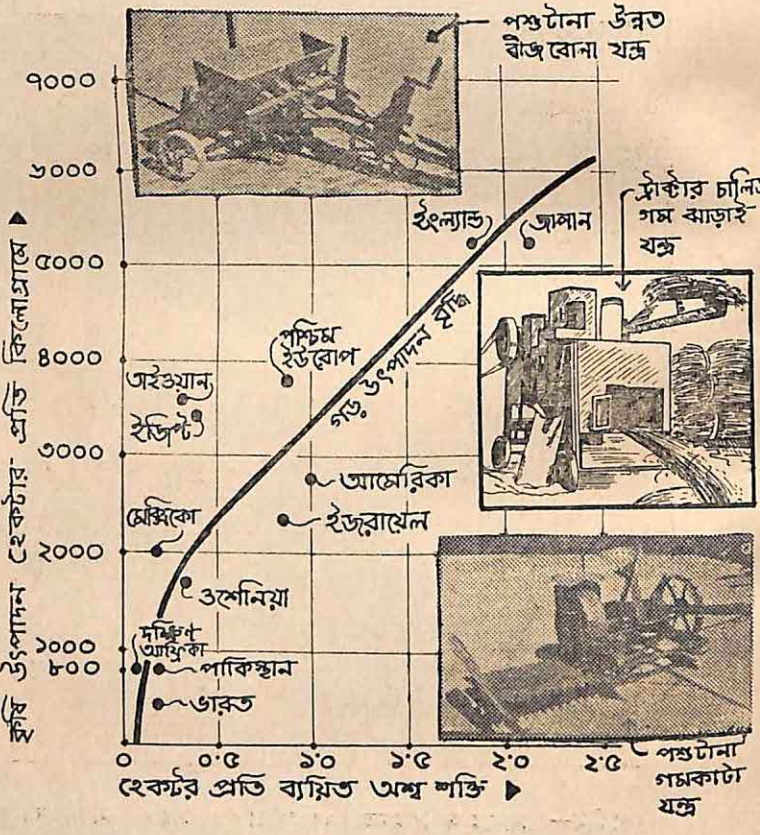

২নং নকশা—মেশিন ব্যবহারে কৃষির অগ্রগতি।

৬নং চিত্র—বেঁকানো অ্যাসবেষ্টস চাদর দিয়ে গোলাকার ছাদ। নাট বলটু দিয়ে আঁটা-ফ্রেমিং এর দরকার নেই ; কাজেই সস্তা অথচ রূপসী।

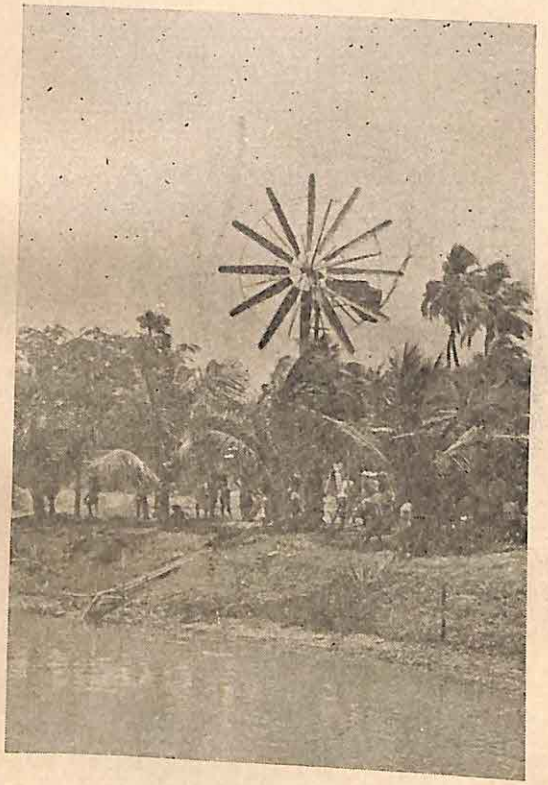

৮নং চিত্র—উইণ্ড মিল সামনের পুকুর থেকে জল তুলছে সোনারপুর থানার আড়া পাঁচ ব্লকে। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প।

৯নং চিত্র—মিলন সংঘ পরিচালিত ট্রেনিং-কাম-প্রডাকশান সেন্টারে স্বল্প শিক্ষিত মেয়েরা ছাতা তৈরী করছেন সোনারপুর কুমড়া খালি গ্রামে।

১০নং চিত্র—উলু বেড়িয়ার কল্যাণ ব্রত সংঘের ডীপ লিটার মুরগী খামার। সুষম খাদ্য ঢেলে দেওয়া হচ্ছে খাদ্য পাত্রে। পালক ছেলেটি প্রতিবন্ধী।

১১নং চিত্র—মৌমাছি পালন, লক্ষ্মীপুর, গোবর ডাঙ্গা। কাঠের তৈরী মৌ বাক্সের বাচ্চা ঘর বা **Brood chamber** এর ফ্রেমে লাগানো মোমের ছাঁচে মৌমাছি বসে আছে। তার বাঁ দিকে দাঁড় করানো ঢাকনাটির গায়ে মৌমাছি যাতায়াতের জন্য গোল জানলা।

১২নং চিত্র—নারকেল ছোবড়া থেকে পাপোষ। ২৪ পরগণার বাগের খোল গ্রামের প্রডাকসান কাম ট্রেনিং সেন্টার। সেন্টারের নিজস্ব বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে গড়িয়ার মোড়ে।

বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি চালু করতে হচ্ছে বেশী করে—আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে। এক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দিকে নজর ফেরানো ছাড়া উপায় নেই। বেকারী ঘোচাতে গ্রামীণ কুটির শিল্পের জাতীয় স্তরেও সম্ভাবনা প্রচুর। শুধু গ্রাম নয়, দেশও এর থেকে উপকার পেতে পারে। সরকারেরই উচিত এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে গ্রামে গ্রামে শিল্পভবন (work shed), বিক্রয়কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

এই সঙ্গে সৃষ্টি করতে হবে গ্রামোপযোগী নতুন নতুন প্রযুক্তি। যেমন ধরুন সাবান শিল্প। একটি নতুনতর পদ্ধতিতে সাবান তৈরী করা যায় বিনা উত্তাপে (গ্রীষ্মকালে, যখন নারকেল তেল আবহাওয়ার তাপেই গলা অবস্থায় থাকে)। পশ্চিমবাংলার আবহাওয়ায় বছরে ১০/১১ মাস এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জ্বালানীর মোটা খরচ বাঁচানো চলে। একটি বিখ্যাত সাবান কোম্পানী পৌনে একশ বছর ধরে সাদা রংয়ের সাবান প্রস্তুত করছিলেন। এর জন্য যে স্বচ্ছ উদ্ভিজ তেল দরকার তা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা বিপদে পড়লেন। এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে প্রযুক্তিবিদদের পরামর্শে তাঁরা চাররকম রঙ্গীন সাবান বাজারে ছাড়লেন (প্রকৃত কারণটা গোপন রইল; লোকে জানল বিভিন্ন সৌখিন মানুষের চাহিদা মেটাতে কোম্পানী লভ্যাংশ কমিয়ে রং-বেরং এর সাবান উৎপাদনে ব্রতী হলেন)। রং মানুষের মন কাড়ল। গোপন প্রযুক্তির জয় হল।

সাবান, ধূপকাঠি বা নানান জাতের কাগজ ও বোর্ড তৈরীর ৯০ শতাংশ কাঁচামালই ভেজিটেবল অয়েল (সাবানের বেলা), বনজ ঔষধি (ধূপের বেলা) নয়ত কৃষি আবর্জনা (কাগজের বেলা)। গ্রামীণ শিল্প হিসাবে তাই এর প্রত্যেকটিই চমৎকার। গুড় শিল্পে আখ থেকে রস নিষ্কাশনের পর যে ছোবড়া পড়ে থাকে তা দিয়ে উঁচুমানের কাগজ বানানো যায়। ভারতে যে কোন শ্রেণীর কাগজের অভাব নিদারুণ (আমেরিকায় জনা প্রতি বার্ষিক কাগজের খরচ ২০০ কেজি আর ভারতে ২ কেজি)। গ্রামে গ্রামে (যেখানেই ঘাস জন্মায়, আখের চাষ হয় কিংবা পাওয়া যায় তুলো ও পাটের আবর্জনা) হস্ত-প্রস্তুত কাগজের শিল্প গড়ে তোলা যায়। এক একটি ইউনিটে খরচ পড়ে ২·৫ লাখ টাকা মত। সহযোগী শিল্প হিসাবে তৈরী করা যায় ষ্ট্র বোর্ড (Straw Board) বা খড়ের বোর্ড, গৃহ নির্মাণে যার ব্যবহার বহুতর (গ্রামীণ আবাসন দ্রষ্টব্য)।

লিখবার চক বা খড়ি (৩৫০০ টাকায় গড়ে তোলা যায় চমৎকার পারিবারিক শিল্প, বিশেষ করে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার অনগ্রসর দরিদ্র অঞ্চলে, যেখানে মূল কাঁচামাল জিপসাম পাওয়া যায় প্রচুর। প্রযুক্তি খুব সরল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চকের চাহিদা বাড়ছেই। কে. ভি. আই. সি.-এর অনুদান ও ঋণ পাওয়া যায়) প্রস্তুতে দামী প্লাষ্টার অফ প্যারিসের দরকার পড়ে। খাদি কমিশন গবেষণা করে যে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভব করেছেন তাতে প্লাষ্টার অফ প্যারিসের ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমিয়ে তা সস্তা কলিচুণ দিয়ে পুরণের ব্যবস্থা আছে। চুণ তৈরী করাতেও খাদি কমিশন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন চুণ ভাটির ডিজাইনে। ভাটিগুলিকে লম্বা করে ও ভিতরে অগ্নি-সহন (Refractory) আস্তরণ দিয়ে তাদের তাপসংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের অবিশ্রাম চলবার ও উচ্চতর মানের চুণ উৎপাদন করবার ক্ষমতা। গ্রামীণ চুণশিল্পে এই নতুন প্রযুক্তি অবশ্য গ্রহণীয়। তাঁরা চুণশিল্পে উৎপাদনের পরিধিও বাড়িয়েছেন। সিমেন্টের পরিবর্ত হিসাবে লিমপো (LYMPO-যা গৃহনির্মাণের খরচাকে ৩০ শতাংশ কমিয়ে দিচ্ছে বলে দাবী করা হচ্ছে), ছাদের ও মেঝের টালি, ফাঁপা ইট (Hollow Block), জালি, মার্বেল ও ঝিনুকের কারুকার্য, শঙ্খশিল্প, রাসায়নিক চুণ-চুণশিল্প নব নব প্রযুক্তিতে বহুমুখী হয়ে উঠছে। এ সব প্রযুক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কে. ভি. আই. সি. করেছেন শোলাপুর, দেরাদুন ও কোট্টায়ামের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে।

আর একটি গ্রামীণ শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প। তিন ভাগে ভাগ করা চলে একে :

(১) টেরাকোটা ও আর্দেন ওয়্যার (শিল্প স্থাপনের আনুমানিক ব্যয় ২৫০০ টাকা, কর্ম সংস্থান ৫/৭ জনের)।

(২) টালী তৈরী (২ ও ৩ নং চিত্র) ও মাটির পাইপ তৈরী (ব্যয় ৩০/৪০ হাজার টাকা, কর্মসংস্থান ১৫/১৬ জনের)।

(৩) ষ্টোনওয়্যার ও পোর্শেলিন (ব্যয় ৫ লাখ টাকা, কর্মসংস্থান ৫৫/৬০ জন)।

ভাটির জ্বালানী ছাড়া শক্তির প্রয়োজন নেই বললেই চলে। নতুন প্রযুক্তি—আর্দেনওয়্যারে স্প্রীং ঘোরানো চাক (ইনভেনসান প্রমোশন বোর্ডের ডিজাইন), টালী তৈরীতে ফর্মার বদলে হাইড্রোলিক প্রেসের চলন (২ নং চিত্র), মাটির পাইপ দিয়ে গ্রামীণ জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ও গ্রামীণ শিল্পে সস্তায় চিমনী তৈরী

(ইট বা চুণ ভাটায়), ষ্টোন ওয়্যারে কেওলিন প্রয়োগ, বর্ষাকালে শিল্পসম্ভার শুকানোর জন্য সঞ্চিত সৌরতাপে উত্তপ্ত গরম বাতাসের ব্যবহার ইত্যাদি। এর কিছু কিছু চালু হয়ে গেছে, বাকি চালু করা দরকার। বীরভূমে ডুমুরে মাটি বলে একরকম মাটি পাওয়া যায় সামান্য কিছু প্রযুক্তিগত হেরফের করলে যা দিয়ে তৈরী তৈজসপত্রকে চকচকে ঝকঝকে পালিশযুক্ত করে তোলার উপায় আবিষ্কার করেছেন কেন্দ্রীয় কাঁচ ও সেরামিক গবেষণা সংস্থা। এ ছাড়া বিভিন্ন রকম জিনিষের জন্য বিভিন্ন গঠন উপাদানের মাটি ব্যবহারের প্রযুক্তিও তৈরী রয়েছে। যেমন ধরুন পুতুল বা মডেলে এঁটেল মাটি ; হাড়ি সরা মালসা টালিতে দোআঁশ এবং কলসী, কুঁজো ও উনুনে বেলেমাটি সবচেয়ে ভাল কাজ দেয়। অতএব স্থানীয় মাটি পরীক্ষা করে ঠিক করা উচিত শিল্প সম্ভার কি হবে।

গ্রামীণ শিল্প বিপ্লবে মেয়েদের পেছিয়ে থাকলে চলবে না। কিছুদিন আগে পশ্চিম দিনাজপুরের গোপালপুর গ্রামে মহিলা সমিতি শ্রমদান করে গড়ে তুলেছেন এক কিলোমিটার পথ। জমির মালিকদের আপত্তিতে রাস্তাটির কোন সংস্কারই হয় নি ১৯৬৫র পর। কিন্তু প্রমীলা বাহিনীর সামনে আপত্তি করবার সাহস হয় নি মালিকদের। শুধু রাস্তা নয়, অর্থ নৈতিক পুনরুজ্জীবনেও পুরুষকে সাহায্য করতে হবে নারীদের। যৌথ প্রচেষ্টাতে গড়ে উঠতে পারে সত্যিকার গ্রামীণ শিল্পক্ষেত্র। তাই মহিলা কর্মীদের উপযুক্ত আরো কিছু শিল্পের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এগুলি হচ্ছে :

(১) মোমবাতি তৈরী।
(২) ছাতা তৈরী ও মেরামতি (৯ নং চিত্র)।
(৩) দেশলাই শিল্প।
(৪) কালি তৈরী (লেখবার ও জুতোর)।
(৫) প্রসাধনী শিল্প (টুথ পাউডার, শ্যাম্পু, কেশতৈল, সুরমা, নেলপালিশ, লিপষ্টিক, আলতা, কুমকুম, ফেস ও বডি পাউডার, কোল্ড ও ভ্যানিসিং ক্রীম ও সিন্দুর প্রস্তুত)।
(৬) লজেন্স ও টফি তৈরী।
(৭) খেলনা ও পুতুল তৈরী।
(৮) শ্লেট পেন্সিল শিল্প।
(৯) রেডিমেড জামা (ফ্রক, কামিজ, পাজামা, ব্লাউজ)

সেলোফেন জড়ানো একরকম মোমবাতি তৈরী করা যায় যাতে মোম গলে পড়ে নষ্ট হয় না। ফলে একই মাপের সাধারণ মোমবাতির তুলনায় প্রায় দেড়গুণ সময় ধরে জ্বালানো যায় এই নতুন মোমবাতি। দামে সামান্য তফাৎ হলেও এ ধরনের মোমবাতির চাহিদা অনেক বেশী, এখনো বাজারে বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। মেয়েদের শেখালে, তাঁদের স্বাবলম্বী করতে একটি সহজ সুন্দর শিল্প হাতে পাওয়া যাবে।

ছাতা তৈরী আর একটি সূক্ষ্ম ও মিহিন শিল্প যাতে মেয়েদের হাত চলে ছেলেদের থেকে ভাল (৯ নং চিত্র)। দেশলাই শিল্পে পশ্চিমবাংলাই এককালে ছিল অগ্রণী। কেবল এই রাজ্যে ৮ কোটি টাকার লেনদেন হয় দেশলাইয়ের বাণিজ্যে। আজ তার ৭০% চাহিদা মেটায় মাদ্রাজের শিবকাশী, সাত্তুর ও কাবিলপট্টির ছোট কারখানাগুলি। বাকি ৩০% যোগান দেয় উইমকো। ছোট কারখানাগুলিকে তামিলনাড়ু সরকার অন্যতম মূল উপাদান পটাশ ক্লোরেট সরবরাহ করেন অনেক সস্তাদরে, দামের উপর ভরতুকি দিয়ে। তাই শিবকাশীর কাছে মার খেয়ে গেছে পশ্চিম বাংলার ম্যাচশিল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এ ভাবে উৎসাহ দেন অন্ততঃ বিশ হাজার বাঙ্গালী মেয়ের অন্ন সংস্থান হয়ে যায়। মেয়েদের মজুরীর চাহিদা কম বলে খুব শীঘ্রই এঁরা হারিয়ে দিতে পারবেন তামিলনাড়ু ও উইমকোকে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে খাদি কমিশন তৈরী। ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র—দু-ধরনের কারখানার জন্য তাঁদের ঋণ ব্যবস্থা আছে ৪৪,১০০ ও ১৮,২০০ টাকার। কর্মসংস্থান হবে ২২ জন ও ৭ জনের।

শহুরে কসমেটিকস এর উচ্চমূল্য গ্রামীণ বধূদের আয়ত্বের বাইরে। তাঁদের সাজবার সাধ অপূর্ণই থেকে যায়। কালির বেলাও সেই একই কথা খাটে। সুলভ মূল্যে স্থানীয় কালি ও প্রসাধনী যদি গ্রামীণ ছাত্র ও গৃহবধূদের হাতে তুলে দেওয়া যায় তা হলে গ্রামের টাকাটা গ্রামেই থেকে যাবে।

আখের রস ও রিফাইনড গুড় থেকে লজেন্স বা টফি (এদের সঙ্গে কিসমিস, নারকেল ও বাদামও ব্যবহার করা যায়), তিলকুট, নাড়ু ইত্যাদি বানানো তো মেয়েদেরই কাজ। তালিকা বাড়িয়ে চলাও যায়—আচার, কাশুন্দী, আমসত্ত্ব, বিস্কুট, মোরব্বা, আমচুর, পাঁপড় (শ্রীমহিলা গৃহোদ্যোগের লিজ্জত পাপড় তো আজ ভারত-বিখ্যাত। এটি দুস্থ মেয়েদের একটি অসাধারণ সমবায় সংস্থা), গুঁড়ো মশলা, চানাচুর, ডালমুট, সেও,

পটাটোচিপ্‌স, পপকর্ণ, কর্ণফ্লেক্‌স, জ্যাম, জেলী, টম্যাটো ও চিলিসস, চুইংগাম, হজমি, চুরাণ, সলটেড বাদাম, আমলকি, হরতুকি মায় চিঁড়ে ও মুড়ি। এ সব উৎপাদনই মেয়েদের কাছে জলভাত। তবে বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য সমবায় দরকার একান্ত ভাবে।

খেলনা, পুতুল ও রেডিমেড জামার বেলা ও ওই একই কথা। উৎপাদন শক্ত নয়। শিল্পের আসল সাফল্য নির্ভর করবে সমবায়িক বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর। প্রশিক্ষণ চাইলে বোলপুরের শ্রীনিকেতনে তা পাওয়া যাবে। বোনা ও সেলাইয়ের জন্য আছে টালিগঞ্জের আনন্দ আশ্রম মহিলা শিল্পপীঠ।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে আইন করে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলির কাছ থেকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, রং, রাসায়নিক ও প্যাকিং দ্রব্য কেনা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এর ফলে শুধু যে ছোট শিল্প তাই নয়, সেখানকার বড় শিল্প-পতিরাও উপকৃত হয়েছিলেন ও বোঝা গেছল বড় ও ছোট উভয় শিল্পই একে অন্যের পরিপূরক। ভারত সরকারও এই ধারাতেই চিন্তা করছেন। কুটির, ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পের জন্য বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করে একটি সাধারণ সংস্থা মারফৎ তাদের সমন্বয় সাধন করলে প্রত্যেকেরই উৎপাদন ও বিক্রয় হার বৃদ্ধি পাবে বলে সরকারের ধারণা। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এ নিয়ে একটি আইনের খসড়া করবার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ভাবে সরকারী সমর্থন পেলে গ্রামীণ কুটির শিল্পের পক্ষে তা হবে সুবর্ণ সুযোগ এবং শিল্প সংগঠক, শিল্প সমবায় ও পঞ্চায়েত—প্রত্যেকেরই উচিত হবে এই আইনের যথাসাধ্য ব্যবহারিক প্রয়োগে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুরোপুরি চাঙ্গা করে তোলা।

৭

জৈবশিল্প

ভারতের পূর্বাঞ্চলে (আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর ইত্যাদি) জন-সংখ্যার ৬৬ ভাগ বাস করেন অথচ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় দেশের মোট উৎপাদনের ১৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে এচিত্র আরো কালো কারণ এখানে পাট, রাসায়নিক ও ইঞ্জিনিয়ারীংয়ের মত ভারী ভারী শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে যাদের বিদ্যুৎ চাহিদা দানবীয়। সম্প্রতি বিদ্যুৎ কমিশনের তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে ১৯৯০ সাল নাগাদ রাজ্যে মোট বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০০ মেগাওয়াট। রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন একটি আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। আণবিক কমিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন কারণ নীতিগতভাবে তাঁরা কয়লা অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গ নিঃসন্দেহে একটি কোল বেল্ট) আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন না। কাজেই আমাদের স্মরণাপন্ন হতে হবে সেই সব শিল্পের যেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার নেই বা খুবই কম।

কিন্তু আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি এই সব কুটিরশিল্পকে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে যে কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই প্যাটার্নে। পরিবহনের খরচ বাঁচাতে। অর্থাৎ জিপসাম পাওয়া যায় পুরুলিয়া প্লেটুতে। চুণ-শিল্প গড়ে উঠবে কেবল সেখানেই। বাঁকুড়ার কাঁকর-মাটিতে মৃৎশিল্প অসম্ভব। মৃৎশিল্পের সীমিত আর্থিক ব্যবস্থায় গাঙ্গেয় সমতল থেকে বাঁকুড়ায় মাটি আমদানীও সম্ভব নয়। কাজেই এই ধরনের শিল্পের বিকাশ পথে কাঁচামালের প্যাটার্ন নিঃসন্দেহে একটি বড় বাধা। জৈবশিল্পে কিন্তু এইসব জ্বালানী ও কাঁচামাল যোগাড়ের হাঙ্গামা নেই। জৈব শিল্প বলতে বোঝায় পশু, পাখী, মাছ, পোকা পালন করে তাদের দুধ-ডিম-মাংস-চামড়া-হাড়-পালক-লোম-গুটি ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা থেকে নানান শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত করা। এধরনের শিল্প স্থান-কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে না; গড়ে তোলা যায় যত্র তত্র এবং এগুলির বিকাশ মূলতঃ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। এখানে আমরা এই ধরনের কিছু শিল্পের প্রযুক্তি সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব।

মহিষ পালনে শ্বেত বিপ্লব

কিছু কিছু সঙ্কর জাতের জার্সী গরু গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় যারা সাধারণ দেশী গরুর থেকে বেশী দুধ দেয়। কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য—মোট গোধনের এক শতাংশও নয়। বাদ বাকি সবই দেশী গরু, আকারে ছোট। দুধও দৈনিক এক লিটারের বেশী দেয় না। এ হারে উৎপাদনের উপর নির্ভর করে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর শিল্প গড়ে তোলা যায় না। শিল্পের জন্য প্রয়োজন এমন দুধ যার উৎপাদন হবে প্রচুর পরিমাণে, যা খুবই ঘন হবে, ঘি বা স্নেহপদার্থ থাকবে অনেক বেশী, কাটালে ছানার পরিমাণও হবে অনেক-খানি। দেশী গরুর পাতলা দুধে এই সব চাহিদারই ঘাটতি। চাইলেই জার্সী গরু দিয়ে দেশ ভরে ফেলা যাবে না। তার জন্য অনেক সময় ও অর্থ দরকার।

ইতিমধ্যে দুগ্ধ শিল্পের চাহিদা মেটাতে বিকল্প হিসাবে মোষ পালন করা যায়। উপরে উল্লেখিত সব রকম শিল্পগত চাহিদাই মোষের দুধে মিটতে পারে। মোষ গরুর থেকে অনেক বেশী দুধ দেয়; সে দুধ অনেক বেশী ঘন; ঘিয়ের পরিমাণ গোদুগ্ধের প্রায় ডবল; ছানাও পাওয়া যায় অনেক বেশী পরিমাণে। এসব দিক দিয়ে দেখতে গেলে ২০ লিটার মোষের খাঁটি দুধ ৩০ লিটার গরুর দুধের সমান। মোষের দুধের দামও বেশী অথচ মোষের দাম গরুর থেকে কম। কাঁচা বা বলকা দুধ হিসাবে অবশ্য গোদুগ্ধই বেশী সুস্বাদু এবং পানীয় হিসাবে মানুষের কাছে গরুর দুধেরই অধিকতর চাহিদা। তবে শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে কাঁচা দুধের স্বাদ-বিস্বাদ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। অনেক বেশী মূল্যবান প্রশ্ন হচ্ছে ওই দুধ থেকে পাওয়া ঘি, ছানা, মাঠা, খোয়া ইত্যাদির পরিমাণ। সে দিক দিয়ে মোষের দুধ চ্যাম্পিয়ান, জার্সী গরুর দুধকেও ছাড়িয়ে যায়।

মহিষ-পালনের আর একটা সুবিধা, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে—মহিষ বেঁধে রাখতে নেই; এরা পুকুর, ডোবা বা খালে বিলে জল কাদায় থাকতে ভালবাসে এবং তাতেই এদের শরীরও নিরোগ থাকে। পল্লীগ্রামে এ সুবিধা পাওয়া খুবই সহজ। কাজেই গরুর মত মহিষ পালনে আলাদা গোয়ালঘরের দরকার পড়ে না। সারাদিন যে চালাঘরে দুগ্ধজাত শিল্পের কারখানা চলে, সন্ধ্যের মুখে কারখানার ছুটি হলে মোষগুলিকে খাল বিল থেকে এনে ওই চালাতেই আটকে রাখা যায় রাতটুকুর জন্য। ভোরবেলা কারখানা চালু হবার আগেই পশুগুলিকে দুধ দুয়ে চালান করে দেওয়া যায় জলায়।

গো-পালনে পশুকে কৃষিজাত শাকসব্জীও খাওয়াতে হয়। মহিষের এসবের প্রয়োজন হয় না। মোষের মূল খাদ্য—খড়, খোল, ভূষি সবই কৃষি আবর্জনার মধ্যে পড়ে। দুধ বাড়াতে, নিরোগ রাখতে গাছ গাছালীর সাহায্য নেওয়া হয়, তাও প্রায় সবই জঙ্গুলে—কচুর ডাঁটা, মানকচু, ওল সিদ্ধ, গুড়ুচীর ডাঁটা, মদ ভাটির ছিবড়ে, ভাতের মাড়, জংলা ঘাস। জংলী কাঁটানটের আস্ত গাছ সিদ্ধ করে খাওয়ালে মোষের দুধ পরিমাণে বাড়ে, বিস্বাদভাবও কেটে যায়। এককথায় গরুর মত মোষ মানুষের কৃষিজাত পণ্যে ভাগ বসায় না। অথচ যে দুধ দেয় তাতে শিল্পজাত পণ্য পাওয়া যায় সর্বাধিক। পণ্য বলতে বোঝায় বেবীফুড, ঘি, বাটার, গুঁড়ো দুধ, কনডেনসড মিল্ক, পনীর, চিজ, খোয়া, ছানা ইত্যাদি।

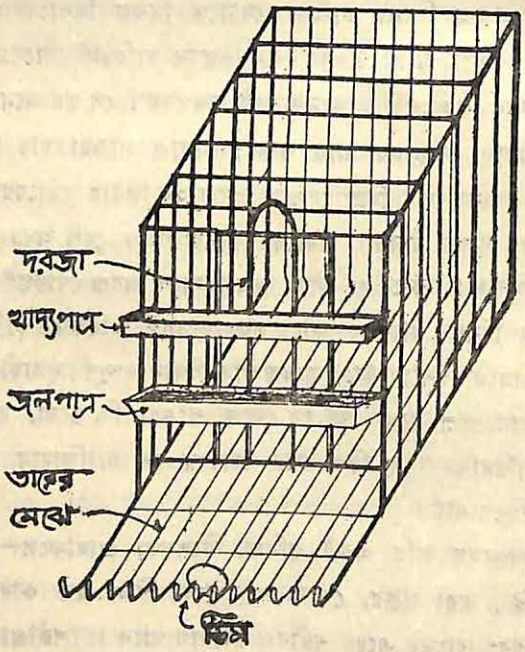

৩৪নং নকশা—মুরগীর খাঁচা

খাঁচায় মুরগী পালন বনাম ডীপ লিটার

পোল্ট্রি শিল্পের প্রাথমিক স্তরে ডীপ লিটার (Deep Litre-১০ নং চিত্র -যে পদ্ধতিতে মুরগীর ঘরের মেঝেতে ৬" পুরু করে খড়ের বা কাঠের কুচির আস্তরণ পেতে রাখা হয়) পদ্ধতিকেই প্রচার করা হয়েছিল এবং লোকে গ্রহণও

করেছিল ব্যাপকভাবে। রাজ্যের দিকে দিকে গড়ে উঠেছে মুরগীর ছোট বড় ডীপ লিটার খামার। ক্রমে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ডিম দেয়া পাখীকে রাখবার জন্য খাঁচা (৩৪ নং নকশা) ব্যবহারের প্রযুক্তি মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। খাঁচায় পাখী রাখা প্রচলিত সাধারণতঃ মৃদু ও স্থিতিশীল আবহাওয়ার দেশে। একটি করে আলাদা আলাদা বা ১০/২০টি পাখীকে একসঙ্গে (Battery Cage) খাঁচায় রাখা চলে। খাঁচা তারের বা বাঁশের কঞ্চি দিয়েও তৈরী হতে পারে। এখন পৃথিবীর ৬২·৪% ডিমপাড়া পাখীই খাঁচায় পালিত হচ্ছে। এ পদ্ধতির নানান সুবিধা। প্রাথমিক খরচ ডীপ লিটারের চাইতে কম। পরিচালন ও রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া অনেক সহজ। দুই পদ্ধতির তুলনা করলে দেখা যায় :

বিবেচ্য বিষয়	খাঁচায়	ডীপ লিটারে
(১) ঘরের খরচ— (Space Need)	কম : পাখী পিছু জায়গা লাগে ১ বর্গফুট বা আরো কম। খরচ বর্গফুটে ৩৫ টাকা।	বেশী : পাখী পিছু জায়গা ৩ বা ৪ বর্গ ফুট। খরচ বর্গ ফুটে ২০ টাকা।
(২) জিনিষ পত্র— (Equipment)	জল ও খাবার ব্যবস্থা সহজ ও বাইরে থেকে।	জল ও খাবার দিতে ঘরে ঢুকতে হয়; লিটারে জল ও খাবার পড়ে পচে ও রোগ সৃষ্টি করে।
(৩) লোকজন— (Personnel)	একজন কর্মী ৬০০০ পাখীর দেখাশুনা করতে পারে।	প্রতি ৫০০ পাখীতে এক জন কর্মী লাগে।
(৪) পরিচালন— (Management)	ব্যক্তিগত মনোযোগ সম্ভব।	ব্যক্তিগত মনোযোগ অসম্ভব ব্যয়সাধ্য।
(৫) বাছাই— (Selection)	উপযুক্ত বাছাই সহজ।	বাছাই সময়সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য।
(৬) ঘরের দেখাশুনো (Maintenance)	দরকার নেই।	লিটার উল্টানো বদলানো সময় ও ব্যয়সাধ্য।

(৭) নষ্ট হওয়া— (Wastage)	খাবার নষ্ট হওয়া নিয়ন্ত্রিত।	খাবার কিছু নষ্ট হবেই।
(৮) রোগ নিয়ন্ত্রণ— (Desease Control)	ককসিও ডিসিস কম হয়, ক্রিমি নিয়ন্ত্রণও সহজ, সংক্রামক রোগ পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।	ককসিও ডিসিসে বাচ্চার মৃত্যুর হার খুব বেশী। পুরোপুরি ক্রিমি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যয়সাধ্য।
(৯) মলের ব্যবহার ও আয়— (Manure Value)	বায়োগ্যাস প্লান্টে চালান দিলে পূর্ণ সদ্ব্যবহার সম্ভব।	লিটার বিক্রি হলে আয় বস্তা প্রতি ১·৫০ থেকে ২·০০ টাকা।

খাঁচার মূলধনী ব্যয় ডীপ লিটারের ৫০-৬০ শতাংশ মাত্র। খাঁচার পাখীদের উৎপাদন ক্ষমতা ও ওজন বেশী হয়। এরা খায় কম, ডিম পাড়ে বেশী। ডিমের গড়পড়তা ওজনও বেশী।

বিবেচ্য বিষয়	খাঁচায়	ডীপ লিটারে
(১) উৎপাদন ক্ষমতা— (Productivity)	১৭৫—২০০ দিন	১৬০—১৮০ দিন
(২) ওজন (৬ মাসে)— (Live weight)	১·৩৫ কেজি (গড়ে)	১·২ কেজি (গড়ে)
(৩) খাদ্য পরিমাণ— (Feed)	দৈনিক ৮৫ গ্রাম	দৈনিক ১০০ গ্রাম
(৪) ডিমের গড় ওজন—	৫১ গ্রাম	৪৯ গ্রাম
(৫) বড় ও বেশ বড় ডিমের হার— (Large & Extra Large Egg)	৮৬·৫%	৭৬%

খাঁচায় পালন ব্রয়লারের (Broiler-যে মোরগ খাওয়ার জন্য পোষা হয়) ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী: ডীপ লিটারে ১৪ সপ্তাহে ব্রয়লারের

যা ওজন হয়, খাঁচায় ১০ সপ্তাহেই তা পাওয়া যায়। মৃত্যুহারও কম (খাঁচায় ৩·৫%, ডীপ লিটারে ৫%)। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে শিল্পক্ষেত্রে এই নতুন প্রযুক্তি খুবই কার্যকরী। মুরগীর শিল্প বলতে বোঝায় গুঁড়ো ডিম (Egg Powder), গুঁড়ো খোলা (Shell Powder), জমানো মাংস (Forzen Chicken), নাইট্রোজেন-ঘটিত সার, পালকের গদি ও ঝাড়ন প্রস্তুত ইত্যাদি। একমাত্র সার ছাড়া আর সবই রপ্তানীযোগ্য শিল্প। গুঁড়ো ডিম ছাড়া অন্যগুলির মূলধনী ব্যয়ও সামান্য।

শিল্পের প্রয়োজনে ডিম সংরক্ষণের এক নতুন প্রযুক্তি বেরিয়েছে যাতে কোল্ড ষ্টোরেজের প্রয়োজন হয় না। নয় লিটার জলে দু লিটার সোডিয়াম সিলিকেট (Water glass) মিশিয়ে তার মধ্যে ডিমগুলো সম্পূর্ণ ডুবিয়ে রাখলে ৬ মাস থেকে ১ বছর অবিকৃত থাকবে, তার খাদ্যমান একটুও কমবে না।

বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ

চিনির পরিবর্তে মূল্যবান খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও ঔষধের অনুপান হিসাবে এবং হিন্দুদের নানান পূজা ও মাঙ্গলিক কাজে মধুর ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়া মৌমাছির প্রত্যক্ষ সাহায্যে ফুল ও চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে থাকে। গাছে ফলন নির্ভর করে ফুলের মিলনের উপর। ফুলের মধ্যে আছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল। পুরুষ ফুলে থাকে রেণু; স্ত্রী ফুলে গর্ভকোষ। এদের মিলনের জন্য মৌমাছির সাহায্যের দরকার। মৌমাছি যখন পুরুষ ফুলে বসে তখন তার পায়ে রেণু লেগে যায়। তারপর ঐ মৌমাছি যদি কোন স্ত্রী ফুলে যায় সেই রেণু ঐ ফুলের গর্ভকোষে গিয়ে পড়ে। এইভাবে গর্ভাধান হয়ে উৎপন্ন হয় বীজ ও ফল। ইউরোপে মৌমাছিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ ১৫—২৫ শতাংশ বাড়ানো গেছে। মৌমাছির সাহায্যে ফুলের এবং ফসলের—উভয় প্রকার উৎপাদন বৃদ্ধিই সম্ভব। যে সব গাছের ফুল খুব হালকা, মৌমাছি তার উপরে বসতে পারে না। যে সব গাছের ফুলে পর্যাপ্ত রেণু পাওয়া যায় মৌমাছির সাহায্যে ফসল বৃদ্ধির জন্য শুধু সেইগুলি উপযোগী।

ফুলের চাষে পরাগ মিলনে মৌমাছির প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া যায় অ্যাস্টার, কর্ণফ্লাওয়ার, জিনিয়া ও সান ফ্লাওয়ারের চাষে। সান ফ্লাওয়ার বা সূর্যমুখী থেকে এক রকম তেল নিষ্কাশন করা যায় যা অতি মূল্যবান ভোজ্য তেল হিসাবে সমাদৃত। এই তেল রক্তে দ্রবীভূত চর্বি কমায়। ফলের মধ্যে আম

ও লেবু জাতীয় ফলে মৌমাছির সাহায্য গ্রহণ খুবই সফল হয় কারণ এইসব গাছের ফুলের মধু মৌমাছির অতি প্রিয় যার ফলে এই সব ফুলে মৌমাছির ঘনঘন যাতায়াতে গর্ভাধান হয় খুব ব্যাপক ক্ষেত্রে। সব্জীর মধ্যে লাউ, কুমড়ো, শশা, পেঁয়াজ সরসে ও মূলোর চাষে মৌমাছিকে লাগানো যেতে পারে পরাগ মিলনের কাজে। এইভাবে ফসল উৎপাদন বাড়াতে হলে নির্দিষ্ট পথে কাজ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন করা হয় কাঠের মৌ বাক্সে। ফসল বৃদ্ধির কার্যক্রমে প্রতি একর চাষের জমির জন্য কমপক্ষে দুটি করে বাক্স বসাতে হবে। বাগান বা কৃষিক্ষেত্র খুব বড় হলে সব মৌ বাক্স এক জায়গায় না রেখে জমির এখানে ওখানে ছড়িয়ে রাখা উচিত।

পশ্চিম বাংলায় সনাতন পদ্ধতিতে মধু পাওয়া যায় সুন্দরবনে। গাছের ডালে মৌমাছিরা মৌচাক তৈরী করে মধু সঞ্চয় করে। সুন্দর বনের নিবিড় অরণ্যে এই রকম অসংখ্য মৌচাক দেখা যায়। সরকারী বন বিভাগ (Forest Department) জঙ্গলে মধু সংগ্রহের লাইসেন্স দেন। মৌ সন্ধানীরা সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর মধু সংগ্রহ করতে বের হয়। গাছের কাঁচা ডাল বা ঘুঁটে পুড়িয়ে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়ানোর পর চাক নিংড়ে মধু বের করা হয়। মৌচাকের ভিতরের কুঠরিগুলিতে বাচ্ছা থাকে, অনেক মৌমাছিও চাক ভাঙ্গার সময় চাপে মরে গিয়ে ভিতরে থেকে যায়। এদের দেহাবশেষ, গাছের ধুলোবালি-নোংরা এবং মাকড়শার জালও মৌচাক নিংড়ে মধু বার করবার সময় মিশে যায়। বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনে মধু নিষ্কাশণ করা হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাক না ভেঙ্গে। ফলে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনের মধু চাক ভাঙ্গা মধুর মত নোংরা ও ময়লা নয়, সত্যিকারের বিশুদ্ধ মধু।

বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনে একটি কাঠের তৈরী মৌ বাক্স (Hive Box) দরকার হয় (১১ নং চিত্র)। এর দুটি অংশ—নীচের বড় অংশটিতে কাঠের ফ্রেমে আটকানো মোমের ছাঁচে ফেলা নকল মৌচাকের কুঠরিতে বাচ্চা পালন ও উপরের ছোট অংশটির ফ্রেমে আটকানো মোমছাঁচে মধু সঞ্চয় করা হয়। ঢাকনায় ও বাচ্চা ঘরের তলায় জাল ঢাকা ফুটো থাকে (১১ নং চিত্রে দেখুন) মৌমাছির যাতায়াতের জন্য। পুরো বাক্সটি বসানো থাকে এক দেড় ফুট উঁচু একটি ষ্ট্যাণ্ড বা টুলের উপর যার পায়ার তলায় থাকে জলপূর্ণ সরা, পিঁপড়ের উৎপাত এড়াতে। একটি বাক্স থেকে ৫/৬ কেজি মধু পাওয়া যায়। স্বাভাবিক

নিয়মেই মৌমাছিরা মধু জমাবে উপরের অংশটির (যার নাম দেওয়া যেতে পারে মধুঘর) ফ্রেমে আঁটা মোমের ছাঁচে।

মধু সংগ্রহের জন্য এই ফ্রেমগুলি বার করে এনে ছুরি দিয়ে মধু কুঠরির মোমের ঢাকনা খুলে ফেলতে হবে। তারপর নিষ্কাশণ যন্ত্রের (Honey Extractor) চার দেয়ালে চারটি ফ্রেম আটকে দিয়ে হাতল ঘোরালেই মধু ঘোরাবার অভিকর্ষে কুঠরি থেকে বেরিয়ে এক্সট্র্যাক্টারের তলদেশে জমা হবে। এই নিষ্কাশণী যন্ত্রটি ওয়াশিং মেশিনের মত একটি ড্রাম যার মধ্যে ঘুড়ির লাটাইয়ের মত একটা ঘূর্ণায়মান বস্তু আছে। এই লাটাইয়ের খাঁজে খাঁজে মধুভর্তি ফ্রেম আটকে লাটাইয়ের উপরের প্রান্তে আটকানো হাণ্ডেল ঘোরালেই লাটাইটি ফ্রেম সমেত বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে। ফ্রেমে আটকানো মোম ছাঁচগুলি অক্ষত থাকে অথচ মধু ফোঁটা ফোঁটা করে বেরিয়ে আসে। খালি মোমছাঁচ সমেত ফ্রেমগুলি আবার মৌ বাক্সে ব্যবহার করা যায়।

নতুন প্রযুক্তিতে এই গ্রামীণ মধুশিল্প যত্রতত্র সম্ভব ; শুধু খেয়াল রাখতে হবে যাতে দেড় কিলোমিটারের ভিতর পর্যাপ্ত পরিমাণে মরশুমী ফুল, শশা, লাউ, কুমড়ো বা তরমুজের চাষ থাকে অথবা আম, লেবু, মুসুম্বি, বেল বা পেয়ারার গাছ থাকে যা থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে বাড়াবে বাগানের ফলন। বাদাম, সরষে বা তুলোর চাষে মৌমাছির সাহায্যে ফলন বৃদ্ধির সফলতা দারুণ। এই বইয়ের গোড়ায় কৃষি ও শিল্পের পরিপূরকতা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সরষে বা তুলোর চাষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালন বা অ্যাপিয়ারী তার একটা চমৎকার উদাহরণ। বৈজ্ঞানিক মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে মেদিনীপুরের তিলান্তপাড়ার সর্বোদয় কেন্দ্রে, দমদমের কৃষি গোপালন শিল্প শিক্ষালয়ে এবং নরেন্দ্রপুরের গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত লোকশিক্ষা পরিষদে।

কীটপতঙ্গকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে আর একটি সম্ভাবনাময় শিল্প যার নাম রেশম শিল্প বা সেরিকালচার। এতদিন ধারণা ছিল রেশম পোকা মানভূম জেলা ছাড়া অন্যত্র গুটি বাঁধে না। সেজন্য এতদিন ধরে রেশমগুটির চাষ পুরুলিয়া-মানভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের একচেটিয়া ছিল। এখন তামিলনাড়ুর সেরিকালচারিষ্টরা প্রমাণ করেছেন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে নদীর

সমতল উপত্যকার আবহাওয়াতেও রেশম চাষ সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে পশ্চিমবঙ্গেও কাজে লাগানো যেতে পারে। রেশমশিল্পের ও কৃষির সঙ্গে সুন্দর পরিপূরক সম্পর্ক আছে। সমতলে রেশমশিল্প গড়ে তুলতে পারলে শিল্প এবং কৃষি দুই-ই উপকৃত হবে।

মৎস্যকেন্দ্রিক শিল্প ও মৎস্য সংরক্ষণ

মাছ বাঙ্গালীর প্রাণ। পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, ভেড়ি, খাল, নিকাশী জল এবং নোনাজলের ৭,৩৫,০০০ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে আরো বেশী মাছ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন রাজ্য মৎস্য দফতর। পশ্চিমবঙ্গে মাছের বার্ষিক প্রয়োজন সাড়ে আট লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৩·৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন। মাছ চাষের প্রারম্ভিক ব্যয়ভার সরকার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ হিসাবে অগ্রিম দেবার আয়োজন করেছেন। সেইসঙ্গে সরকারী অনুদানেরও পরিকল্পনা হচ্ছে। জেলায় জেলায় মাছচাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়েছে। এই সব ব্যবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে পারলে এক নতুন গ্রামীণ শিল্পের দিগন্ত খুলে যেতে পারে। বর্তমানে সাড়ে আঠারো লক্ষ একর জলকরে মিশ্র চাষ হয় রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস, অ্যামেরিকান রুই, কৈ, সিঙ্গি, মাগুর, শাল, শোল, বোয়াল, ভেটকি, তেলাপিয়া ইত্যাদি। ইদানিং রূপালী রুই (সিলভার কার্প) ও ঘেসোরুই (গ্রাসকার্প) নামে দ্রুত বৃদ্ধিশীল মাছও চাষ করা হচ্ছে।

সাধারণতঃ বারোমেসে বড় পুকুরে (৬ নং নকশা ২০ পৃঃ—২ বিঘা মাপ, গরমকালেও ৭।৮ ফুট জল থাকে, তলায় অন্ততঃ ১ ফুট পাঁক, পানা ও আগাছাহীন ও শ্যাওলাযুক্ত সবজেটে জল) রুই, কাতলা, মিরগেল বা কালবোসের চাষ হয় এবং ছোটখাট ডোবায় হয় চুনোমাছ, বাগদা, শোল ও চিতলের চাষ। গরমে শুকিয়ে যায় এ রকম এঁদো পুকুরের তলার পাঁকে চলতে পারে কই, মাগুর, সিঙ্গির চাষ। পুকুরে কিছু পরিমাণ ঝাঁজি ও পানার প্রয়োজন থাকলেও দেখতে হবে পুকুরের উপর যাতে প্রচুর সৌরালোক পড়ে। সূর্যরশ্মি না পেলে মাছ বাড়ে না। মাছ চাষের পুকুরে মানুষের দৈনন্দিন শুচিকর্ম, স্নান, বাসনমাজা, কাপড় কাচা যত হয় ততই মাছ চাষের পক্ষে ভাল। এতে মাছেদের ব্যায়াম ও জৈব খাদ্যের পরিমাণ বাড়ে। ফলে মাছ বড়, ভারী ও সুস্বাদু হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের চাইতে শ্যাওলা ঘোলা

সবুজাভ জল মাছ চাষে বেশী কাঙ্খিত। প্রতিমাসে একবার করে মিশ্রসার প্রয়োগ করতে হবে পুকুরে। দু-ভাবে তৈরী করা যায় এই সার :

(১)	গোবর—	১২৫ কেজি	(২)	গোবর—	২৫০ কেজি
	খৈল—	১৭৫ „		অ্যামন সালফেট—	১০ „
	কচুরীপানা—	১২৫ „		সুপার ফসফেট—	৬ „
	ঝাঁজি—	৭৫ „			

উপরের হিসাব বিঘাপ্রতি। পুকুরের মাপ অনুযায়ী তারতম্য হবে।

এ ছাড়াও মাছকে কিছু খাবার দিতে পারলে মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। এ খাবার তৈরী হয় ৫০ ভাগ ডালের কুঁড়ো বা গমভূষির সঙ্গে ৫০ ভাগ সরষের খোল মিশিয়ে। পরিমাণ প্রতি ১০০ মাছ দৈনিক—

১-৩ মাস— ৪০০ গ্রাম
৪-৬ মাস— ৮০০ গ্রাম
৭-৯ মাস—১২০০ গ্রাম
১০-১২ মাস—১৬০০ গ্রাম।

এ ভাবে যত্ন নিলে ১ বছরের রুই ও কাতলা ১৬ ইঞ্চি ও কালবোস ১২ ইঞ্চি সাইজের হয়ে উঠবে।

কৃত্রিম উপায়ে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড ইনজেকসান দিলে মাছের ডিম ছাড়ার হার বেড়ে যায়। এই প্রযুক্তি নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে সরকারী স্তরে। জৈবিক পচনক্রিয়ার ফলে অনেক সময় পুকুরের জলের অম্লভাব বা অ্যাসিডিটি বেড়ে যেতে পারে যার সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পুকুরের মাছ মরতে শুরু করবে। অম্লভাব থাকলে পুকুরের জলে লিটমাস কাগজ ডোবালে তা নীল থেকে লাল হয়ে উঠবে। বিঘাপ্রতি ১ কেজি পাথুরে চুণ জলে মেশালে অ্যাসিডিটি কেটে যাবে।

মাছের সংরক্ষণে এতকাল বরফের চাঙ্গড় ব্যবহার করা হত। ইদানীং গুঁড়ো বরফ (আলগা প্যাকিং) ও তরল নাইট্রোজেনের ব্যবহারে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করে তোলা হয়েছে। তরল নাইট্রোজেনের ব্যবহারে খুব তাড়াতাড়ি মাছকে 'অতি হিমায়িত' করে বহুদূরের হিমঘরে নিয়ে যাওয়া চলে ধীরে সুস্থে। পচন-ক্রিয়ার ভয় একেবারেই থাকে না। আর এক রকম সংরক্ষণ হয় কড়া রোদে মাছ শুকিয়ে বা জলশূন্য করে। এতে দরকার হয় কমপক্ষে ১১৫° ফারেনহাইট উত্তাপ (পচন ক্রিয়ার জন্য দায়ী জীবাণুগুলি ৫৫° থেকে

১১০° ফারেনহাইট উত্তাপে সংখ্যায় খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। উত্তাপ এর উপরে বা নীচে নাবাতে পারলে পচন পদ্ধতিকে অনেকটা বিলম্বিত করা যায়)। এভাবে শুঁটকী মাছ করার পদ্ধতি দুরকম—হয় নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে বা কাঠের উনুনের ধোঁয়া দিয়ে জলশূন্য করে। এই দুই পদ্ধতির সমাবেশ ঘটানো যায় সৌরচুল্লীতে উত্তপ্ত গরম হাওয়ার সাহায্যে। তাতে কাঠের জ্বালানী বাঁচানো যায়, ধোঁয়া ব্যবহারের যন্ত্রণার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। এ ধরণের উন্নত চুল্লী অবশ্যই সমবায়িক ভিত্তিতে করতে হবে। শুঁটকী মাছের প্রসারে প্রধান অন্তরায় তার গন্ধ। এই গন্ধ অপসারণের যদি কোন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয় তা হলে এ মাছের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে।

অ্যালগি-কালচার (পানা ও ঝাঁজির চাষ) ও মাছ চাষ একে অপরের পরিপূরক। অ্যালগি (পানা:কচুরী, গুঁড়ি, ক্ষুদি ও উল্কি এবং ঝাঁজি:পাটা, ঝাউ, শেওলা ও হিঞ্চা) পশু ও মুরগী পালনে সবুজ খাদ্য এবং কৃষিতে সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও অষুধ, রাসায়নিক ও অন্যান্য নানান শিল্পে লাগে।

ম্যালেরিয়া নিবারণে কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, পুঁটি, চাঁদা ও খলসে মাছকে কাজে লাগানো যায়। এরা মশার ডিম খেতে খুব ভালবাসে। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তিতে মিশ্র মাছ চাষ প্রদ্ধতি ও প্রণোদিত প্রজনন (Induced breeding—যাতে জলে স্ত্রীমৎস্যের যৌনগন্ধী গ্রন্থিরস ছড়িয়ে পুরুষ মাছকে উত্তেজিত করে তোলা হয়) পদ্ধতি খুব সুফল দিয়েছে। ডিমপোনা তৈরীর জন্য বিশেষ আঁতুড় পুকুর ব্যবহারও এক নতুন ও সফল প্রযুক্তি। গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায় এমন পুকুরে ডিমপোনার আতুড় করতে হয়। গরমে শুকনো পুকুরে ধঞ্চেচাষ করে জল দাঁড়াবার আগেই গাছগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। পরে জলে বিঘাপ্রতি ৩০ কেজি চুণ ও ১০০ কেজি মহুয়ার খোল দিলে আগাছা, ব্যাঙচি ও পোকামাকড় ধ্বংস হবে। দেড় সপ্তাহ বাদে বিঘা প্রতি ৬০০ কেজি কাঁচা গোবর দিলে আঁতুড় তৈরী। দু-সপ্তাহ বাদে জল সবুজ হয়ে উঠলে ডিম পোনা ছাড়তে হবে।

জাপানের মানুষ বছরে গড়ে ৪৪ কেজি মাছ খান। বর্মায় ৩৪ কেজি। পশ্চিমবঙ্গে ৩ কেজি মত। কাজেই বোঝা সহজ এখানে মাছের চাহিদা অনেক বাড়ানো যেত যদি দাম কমানো যেত। মাছ চাষীর কাছ থেকে

আসল ক্রেতার হাতে যায় অন্ততঃ চারটি হাত ঘুরে। প্রতি স্তরে মুনাফা রাখার দরুণ আসল ক্রেতার কাছে পৌছতে দাম অনেক বেড়ে যায়। সমবায়ের মাধ্যমে ফড়েদের বাদ দিয়ে যদি চাষীর কাছ থেকে সরাসরি ক্রেতাকে পৌছানো যায়, তা হলে মাছের দামও কমবে, চাষীও ন্যায্য পাওনা পাবে।

চর্ম ও সংশ্লিষ্ট শিল্প

পশুপালনের (গো, শূকর, ছাগ বা ভেড়া) একটি প্রধান অঙ্গ হল চর্ম ও সংশ্লিষ্ট (শিং ও হাড়ের শিল্পকলা, জুতো ও ব্যাগ শিল্প, তুলি, ব্রাস, পশমিনা শাল, কম্বল ও গ্লু (Glue) তৈরী, চামড়ার জামা, ফুটবল বা বেল্ট তৈরী ইত্যাদি) শিল্প সমূহ। কে. ভি. আই. সি. এই শিল্পকে গ্রামীণ রূপ দিয়েছেন। একটি বড়সড় গ্রামীণ ট্যানারীতে অন্ততঃ ২৫ জন লোক কাজ পেতে পারেন। ধার ও অনুদান মিলিয়ে মোট সাহায্য তিরিশ হাজার টাকারও বেশী। মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, চামড়া পাকাকরণ, হাড় গুঁড়ো করা, ক্রোম চামড়া তৈরী, চামড়া পালিশ, হ্যাণ্ডব্যাগ-বটুয়া-কয়েনপার্স-ওয়ালেট-শপিংব্যাগ ইত্যাদি তৈরী, বাটিকের কাজ প্রভৃতি নানান শিল্প চক্র গড়ে উঠতে পারে মৃত পশুকে কেন্দ্র করে। এ সব শিল্পের বিদেশী চাহিদাও প্রচুর।

হিমায়িত মাংস

দুধ ছাড়াও পশুপালনের আর একটি আনুষঙ্গিক শিল্প হল মাংস (কাঁচা ও সিদ্ধ—যাকে ইংরাজিতে বলে Fresh ও Processed)। পশুভেদে এগুলির বিভিন্ন নাম—মাটন, বিফ, পর্ক, হ্যাম, বেকন, সসেজ, সালামি, অক্স টাং, লার্ড ইত্যাদি। ভারতে কেবল ছাগলের মাংসই বিক্রি হয় বছরে ৮৩ কোটি টাকার। এরপর আছে গরু, শুয়োর, ভেড়া, হরিণ, হাঁস, মুর্গী, টার্কি, কচ্ছপ, চিংড়ি এবং ব্যাঙ। শুধু দেশী নয়—বৈদেশিক চাহিদাও প্রচুরতর।

৮

কৃষিশিল্প

এই অধ্যায়ের শিল্পগুলিকে সামগ্রিকভাবে বলা চলে উদ্ভিজ শিল্প, যাকে ভাগ করা চলে দুটি অংশে :

(ক) কৃষিজাত পণ্য ও আবর্জনাভিত্তিক শিল্প এবং

(খ) বনজ শিল্প (যেমন কাঠ বা বাঁশভিত্তিক শিল্প)।

অসংখ্য শিল্প গড়ে উঠতে পারে এভাবে। এর মধ্যে প্রায় ডজন খানেক শিল্পকে বাছাই করে নিয়ে কে. ভি. আই. সি. (খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন) গ্রামীণ শিল্প হিসাবে তাদের উপযোগিতা ঘোষণা করেছেন, নানা রকম প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধনের জন্য গবেষণা চালাচ্ছেন এবং এইসব শিল্প স্থাপনে ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করছেন। এইসব শিল্পগুলি হল :

(১) অভক্ষ্য তেল—সিট্রোনেলা, তারপিন ও অন্যান্য উদ্ভিজ তেল যা মূলতঃ রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োজন হয়।

(২) ভোজ্য তেল/ঘানি—ঘানি যন্ত্রের প্রযুক্তিগত উন্নতি করে সরষে, বাদাম, সূর্যমুখীর বীজ, নারকেল প্রভৃতি কৃষি ও বনজ পণ্যের থেকে তেল নিষ্কাশন এক ভাল শিল্প হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। বিদ্যুৎ চালিত ঘানিও আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধানের তুষ থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদনের প্রকল্প তৈরী করছেন। এই তেল চর্বিহীন ও উচ্চমানের। জাপানে এই প্রকল্প খুব চালু হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পের দায়িত্ব অত্যাবশ্যক পণ্য সংস্থার।

(৩) তালগুড়—যেসব পরিবারে এক বা একাধিক মানুষ আছেন যাঁরা গাছে চড়ে রস পাড়তে সক্ষম, সেরকম পরিবারের পক্ষে একটি সুন্দর পারিবারিক শিল্প যার জন্য ২০০০·০০ থেকে ২৫০০০·০০ টাকা ধার পাওয়া সম্ভব কে. ভি. আই. সি.র কাছ থেকে। বিক্রয় ব্যবস্থায় সহায়তা করেন তালগুড় শিল্প সমবায় মহাসংঘ।

(৪) শস্য ভানাই ও পেষাই—ভারতে উৎপন্ন সমস্ত ধান কলে ভানলে যেখানে দেড়লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়, সেখানে ঐ ধান হাত কুটাই ও ঢেঁকিতে ভানলে ৬২ লক্ষ লোক কাজ পেতে পারেন।

উন্নত ধরনের ঢেঁকি, চাকি, উদুখল, মুষল প্রভৃতি হস্তচালিত সরঞ্জাম ছাড়াও বিদ্যুৎচালিত ধান ভানাই ও চাল পালিশ যন্ত্রের (১নং নক্সা—১১ পৃঃ) নক্সা প্রস্তুত করেছেন কমিশন যা ২০০ থেকে ৩০০ কেজি ধান ভানাই বা চাল ছাঁটাই করতে পারে এবং যার দাম ৪৫০০·০০ টাকার মত। এই সব যন্ত্রের ছোট বড় বেশ কয়েকটি মডেল বাজারে চালু রয়েছে। নীচের তুলনামূলক চার্ট থেকে সহজেই বোঝা যায় খাদ্যপ্রাণের হিসাবে ঢেঁকি-ছাঁটা চাল মিল-ছাঁটার থেকে অনেক উন্নত :

উপাদান	ঢেঁকিছাঁটা	মিলছাঁটা
প্রোটিন	৮·৫%	৬·৯%
ফ্যাট	০·৬%	০·৪%
ফসফরাস	০·১৭%	০·১১%
লৌহ	২·৮ mgs%	১·০২ mgs%
ভিটামিন এ	৪	০
ভিটামিন বি	৬০	২০

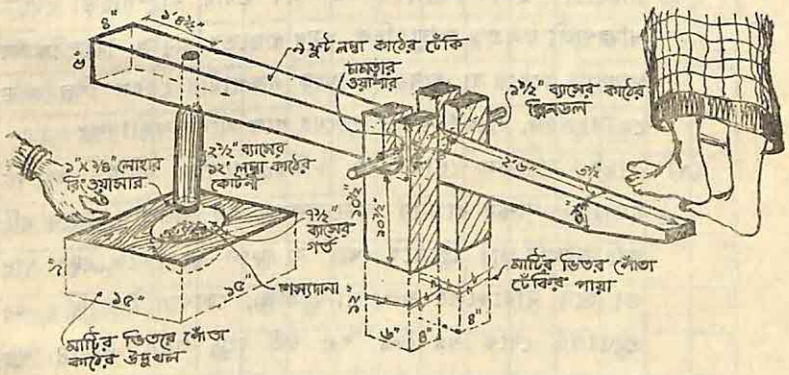

৩৫নং নক্সা - ধান ভানাই ঢেঁকি

অতএব শুধু শিল্পগত দিক দিয়ে নয়, জনস্বাস্থ্যের খাতিরেও আশু ঢেঁকিছাঁটাই চাল চালু হওয়া দরকার (৩৫ নং নক্সা)

(৫) সুতী খাদি—রেশম বা পশম খাদির মত সুতী খাদিও চমৎকার গ্রামীণ শিল্প। তুলা চাষের পরিপূরক। ধাতু নির্মিত নব মডেল

চরখার অন্তত ১০,০০০টি সারা দেশের ৩৫৮টি খাদি কেন্দ্রে কাজ করে চলেছে। এর আরো উন্নত সংস্করণ হবে প্যাডেল চালিত ১২ টেকোর যান্ত্রিক চরখা যার যান্ত্রিক নক্সায় সুতো কাটার প্রায় সমস্ত আধুনিকতম কৌশল সংযোজিত হয়েছে।

(৬) ঔষধি—কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ খয়রা প্রফেসার ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও পশ্চিমবঙ্গের রিজিওনাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট অব আয়ুর্বেদের প্রযোজনায় গাছ গাছড়া থেকে মৃগী রোগের এক অব্যর্থ ওষুধ বার করেছেন। শুশনি ও জটা মানসি গাছ থেকে প্রস্তুত ওই ট্যাবলেটের ফরমূলা যে কোন গ্রামীণ আয়ুর্বেদিক শিল্প প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করিতে পারেন।

এই রকম সম্ভাবনাময় আরো কয়েকটি গাছের ও যে সব রোগ প্রতিরোধে তাদের কবিরাজী (বা টোটকা) ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলির তালিকা দিলাম (১১৭ পৃষ্ঠায়)।

এছাড়া আছে সর্পগন্ধা, আকন্দ, আমড়া, কৎবেল, জাম, ত্রিফলা, দূর্বাঘাস, পেঁপে, লবঙ্গ, বেল, বেলেডোনা, শ্বেত ও রক্তচন্দন, সিলোট্রাম মুডাম ইত্যাদি। এই সব ঔষধি গাছ-গাছড়া থেকে শক্তিশালী ফলপ্রসূ আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতের প্রযুক্তি নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে বা হবে তা থেকে একগ্রামীণ ভেষজ শিল্প গড়ে তোলা সহজ, যা অর্থকরী ও মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর।

(৭) মাদুর / নারকেল ছোবড়া ও দড়ির পাপোষ, ম্যাট, কার্পেট ইত্যাদি—পশ্চিম বাংলায় নারকেলের ফলন অজস্র। তাকে যদি কচি অবস্থায় ডাব হিসেবে খেয়ে না ফেলে ঝুনো হতে দেয়া যায় তা হলে নারকেলের জল, শাঁস, মালা, ছোবড়া ইত্যাদি (এর প্রত্যেকটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প সৃষ্টি হতে পারে) নানান শিল্প উপাদান পাওয়া যেতে পারে। এর থেকে নারকেল দড়ি, হুঁকো, খেলনা, কৌটা, বাটি, পাপোষ, কার্পেট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও সৌখিন শিল্প সম্ভার তৈরী করা যেতে পারে (১২ নং চিত্র)।

(৮) বেত ও বাঁশের কাজ—নারকেলের মতই পশ্চিমবাংলায় বাঁশ এর প্রাচুর্য। এক এক শ্রেণীর বাঁশ এক এক কাজে লাগে। 'তলতা' (সোজা খাড়া কঞ্চি বিহীন) বাঁশ দিয়ে মাছ ধরবার সরঞ্জাম তৈরী

রোগ	কলা	তেলাকুচো	ঝিঙে	কালমেঘ	থানকুনি	নিম	রসুন	আদা	পেঁয়াজ	তুলসী	হলুদ	বাসক	পুনর্নবা
অনিদ্রা													●
আমবাত										●			
অর্শ									●				
কোলেস্টেরাল							●						
দাঁতব্যথা									●				
যক্ষ্মা							●					●	
বাত							●	●					
কাটা/আঘাত					●								
চুল পাকা						●					●		
ফোড়া						●							
উকুন						●							
নেবা (জন্ডিস)						●							
ঘা/চর্মরোগ					●	●			●			●	
বসন্ত												●	
বিষক্রিয়া										●			
লিভার				●		●	●			●	●		
আমাশয়					●	●		●		●			
ঘামাচি			●										
খোসপাঁচড়া			●							●		●	
অগ্নিমান্দ্য			●				●	●					
কোষ্ঠবদ্ধতা			●	●					●				
হাঁপানি		●									●		
সর্দিজ্বর		●						●	●	●		●	
মাথাঘোরা									●				
কানপাকা	●								●	●			
ডায়াবেটিস	●	●									●		●
ক্রিমি	●			●									
শুকনো কাশি	●											●	

হয়, তরু বাঁশ (পাতলা ভরাট বাঁশ) দিয়ে ছিপ, ছাতার বাঁট, লাঠি ইত্যাদি তৈরী হয়। ভরাট জাওয়া বাঁশে তৈরী হয় লাঠি, খুঁটি। ভালকো (ঝাড়ালো মোটা ফাঁপা বাঁশ) দিয়ে বানানো হয় দরমা বা চ্যাটাই। পাতলা পাতলা কঞ্চিগুলো দিয়ে ছিপ, তীর, খেলনা, ঝুড়ি, পাখির খাঁচা, মাছ ধরার ঘনি—কত কি তৈরী হতে পারে। নানান জাতের বেত কাজে লাগে ঝুড়ি, আসবাব ও পার্টিশান বুনতে। চেষ্টা করলে পশ্চিমবঙ্গে ভাল বেত উৎপাদন করা যেতে পারে। এই দুই শিল্পে ধার ও অনুদান মিলিয়ে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে কারখানার জন্য। হাতে কলমে কাজ শেখবার ব্যবস্থা রয়েছে বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের ক্যালকাটা অরফ্যানেজ রামবাগানে লোকশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত ট্রেনীং কাম প্রোডাকসান সেণ্টার ও কাশিয়াং-এর সেণ্ট আলফোন্সাস ইনডাষ্ট্রিয়াল স্কুলে।

(৯) কাঠের কাজ—অতি ক্ষুদ্র থেকে বৃহদায়তন কাঠের কারখানা গড়ে তোলা যায়, যাতে ২ থেকে ২৪ জন মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে ; সাহায্য পাওয়া যায় এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত। কাঠ শিল্প এক অতি নিবিড় গ্রামীণ শিল্প। বনে গাছ চিহ্নিতকরণ, গাছ কাটা, কাঠ চেরাই (Logging), কারখানা বা গোলাতে নিয়ে আসা, সিজনীং, জয়নারি (Joinery) বা অন্যান্য জিনিস তৈরী, রং-পালিশ ও বিক্রয় ব্যবস্থা···মানুষের এই বনজ সম্পদ থেকে বহুশত মানুষের জীবিকা জুটতে পারে। এ ছাড়াও আছে কাঠ থেকে অ্যালকোহল ও নানা রাসায়নিক উৎপাদন ও কাঠ শিল্পের পরিত্যক্ত অংশ (গুঁড়ো, ছাঁট, পাতা, বাকল) দিয়ে তৈরী শিল্প সম্ভার।

কাঠের প্রাকৃতিক সিজনীং সময় সাপেক্ষ বলে আজকাল সিজন-করা কাঠ পাওয়াই যায় না। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে সিজনীং দ্রুততর করা যায়।

(১) ঠাণ্ডা জলে সিজনীং—কাঠের লগটিকে ৩/৪ সপ্তাহ জলে ডুবিয়ে রাখলে একমাসেই সিজনীং হয়ে যায়। পরে ছায়ায় শুকাতে হবে।

(২) ফুটন্ত জলে সিজনীং—এই পদ্ধতিতে সিজনীং এর সময় ছ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা যায়। তবে এ প্রণালী বেশ ব্যয়সাধ্য।

(৩) গরম বাতাস বা বাষ্পের সাহায্যে সিজনীং—হিট চেম্বার বা

তাপকক্ষে কাঠ সাজিয়ে গরম বাতাস বা বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়। এ প্রণালীও ব্যয়সাধ্য।

শেষোক্ত দুই প্রণালীতে জল, বাতাস বা বাষ্প গরম করতে সৌর শক্তির সাহায্য নিলে জ্বালানীর খরচা কমে যাবে—এই উন্নত প্রযুক্তি গ্রামীণ শিল্পের আর্থিক ক্ষমতার আয়ত্তে আসবে। উপকূল অঞ্চলে হল্যাণ্ডের দেখাদেখি কাঠ চেরাইয়ে হাওয়া কল বা উইণ্ড মিল কাজে লাগালে শিল্পের দৈনন্দিন কাজ চালানোর খরচ আরো কমবে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কাঠের নাম, গুণ ও ব্যবহার এখানে দেওয়া হল :

শাল—(ভারী শক্ত কাঠ, জলে নষ্ট হয় না, ওজন ঘনফুটে ২৮ কেজি, চেরাই কষ্টকর, পালিশ ধরে না) ঘর, বাড়ী, রেল স্লীপার সেতু প্রভৃতি গড়ার ইন্‌জিনিয়ারীং সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করা হয়।

সেগুন—(হাল্কা, ভার বহনে সমর্থ, ওজন ঘনফুটে ২২ কেজি, চেরাই সহজ, ভাল পালিশ ধরে) ইন্‌জিনিয়ারীং ও আসবাব তৈরীর কাজে লাগে।

দেবদারু—(সমান্তরাল আঁশ, হালকা রং, বেশী টেকে না, ওজন ঘনফুটে ১৭ কেজি, তৈলাক্ত কাঠ ভাল পালিশ ধরে না) সস্তা কাজে ব্যবহার হয়। যেমন—রেলস্লিপার, জেটি, প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি।

সুন্দরী—(গাঢ় লাল, ঘন, শক্ত ও স্থায়ী, ওজন ঘনফুটে ২০ কেজি) গ্রামীণ আবাসন ও অন্যান্য সস্তা আসবাবে কাজে লাগে। এছাড়া তৈরী হয় কড়ি, বরগা, খুঁটি, পাইল ইত্যাদি।

অর্জুন—(মোটা এলোমেলো আঁশ, ভারী ও শক্ত কাঠ, চেরাই কষ্টকর, ভাল পালিশ ধরে, ওজন ঘনফুটে ২৫ কেজি) সাদামাটা সস্তা আসবাবে প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া তৈরী হয় কড়ি, বরগা, মাস্তুল, গরুর গাড়ী, মাকু প্রভৃতি।

শিশু—(সুন্দর আঁশ, চেরাই কষ্টকর, ওজন ঘনফুটে ২৭ কেজি) ভাল আসবাব তৈরীর কাঠ। নৌকা ও খেলার উপকরণ তৈরীর কাজে লাগে।

আম—(স্বল্প স্থায়ী, ধূসর বর্ণ, শক্তকাঠ, মোটামুটি পালিশ ধরে,

ওজন ঘন ফুটে ২২ কেজি) খুব সস্তার আসবাব ও দরজার পাল্লা, নৌকা ও প্যাকিংবাক্স।

জারুল—(হাল্কা, বাদামী, মসৃণ কাঠ, শক্ত, ওজন ঘনফুটে ২০ কেজি, সহজে চেরাই হয়) সস্তার কাজে ব্যবহার হয়।

পেয়ারা—(শক্ত, হালকা নমনীয় কাঠ) বিশেষ ব্যবহার নাই। খন্তাদির হাতল তৈরী হয়।

শিমুল—(হালকা, নরম, সাদা কাঠ, ভাল পালিশ ধরে না, ওজন ঘনফুটে ১২ কেজি) জলের নীচে ব্যবহারের উপযোগী। এ ছাড়া প্যাকিংবাক্স, দেশলাই শিল্পে লাগে।

কাঁঠাল—(গাঢ় হলুদ রং, মোটা আঁশ, স্বল্পস্থায়ী কাঠ, ওজন ঘনফুটে ১৫ কেজি) সস্তা দরজা চৌকাঠে ব্যবহার হয়। এছাড়া নৌকা ও কড়ি বরগা তৈরী করার কাজে লাগে।

শিরিষ—(হলুদ বা কালো দু-জাতের, ভালো পালিশ ধরে, চেরাই কষ্টকর, দীর্ঘস্থায়ী ভারি কাঠ, ওজন ঘনফুটে ২৭ কেজি) মাঝারী দামের আসবাব তৈরীর কাজে লাগে। গরুর গাড়ী, কড়ি, বরগা ও খুঁটি তৈরীর কাজে লাগে।

তেঁতুল—(স্থায়ী গাঢ় বর্ণের কাঠ) ব্যবহার—গরুর গাড়ী ও যন্ত্রাদির হাতল নির্মাণ।

গামার—(ঘন আঁশ, ফিকে হলুদ রং, হালকা, শক্ত কাঠ, দীর্ঘস্থায়ী ওজন ঘনফুটে ১৫ কেজি, ভাল পালিশ ধরে) আসবাব, নৌকা ইত্যাদিতে দরকার।

(১০) গুড় ও খান্দসারী শিল্প—আখ চাষের সহযোগী ও পরিপূরক গ্রামীণ শিল্প হিসাবে খুবই উপযোগী। পারিবারিক শিল্প হিসাবে (৪-১২ জনের কর্মসংস্থান) বা সমবায়িক শিল্প হিসাবে (২০-১৫০ জনের কর্মসংস্থান) গ্রহণ করা যায়। ডিরোলাক্স (Derolux) একটি নতুন ইক্ষু পেষকযন্ত্র। কে. ভি. আই. সি. উদ্ভাবিত এই যন্ত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ রস নিষ্কাশন করা যায়—এ যাবৎ যে পরিমাণ রস পাওয়া যাচ্ছিল সনাতন এক্সট্রাক্টারে তা থেকে প্রায় ১০ ভাগ বেশী পাওয়া যাবে। লক্ষ্ণৌর ডিজাইনে ছোট আকারের চিনিকল স্থাপন এ শিল্পকে আরো প্রসারিত করে তুলতে পারে।

(১১) অন্যান্য গ্রামীণ শিল্প—এ ছাড়াও বহুতর শিল্প নিয়ে কে. ভি. আই. সি নানারকম প্রযুক্তিগত গবেষণা করে চলেছেন কমপক্ষে আটটি গবেষণা কেন্দ্রে। এদের মধ্যে পথিকৃৎরূপে কাজ করছেন যমুনালাল বাজাজ সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ওয়ার্ধা। এঁরা যে সব শিল্পের যন্ত্র সরঞ্জাম ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে সেগুলিকে গ্রামীণ শিল্পের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন তার মধ্যে রয়েছে :

(ক) লাক্ষা শিল্প (খ) ফল সংরক্ষণ (রস, ঠাণ্ডা পানীয়, আচার, শশ, জেলী, চাটনী ও সংরক্ষিত ফল) (গ) পাটজাত দ্রব্যাদি (ঘ) গঁদ ও রজন তৈরী (ঙ) খয়ের তৈরী এবং (চ) পাঁপড় প্রস্তুত। এগুলি সবই কৃষি-শিল্প। এর সঙ্গে সস্তার প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হলে সব্জী সংরক্ষণও শিল্প হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। সাধারণতঃ এরজন্য যে জল শূণ্য ও বায়ু শূণ্য অবস্থায় টিনজাত করা ও হিমায়ন প্রক্রিয়া চালু আছে তা ব্যয়-বহুল। তবে সস্তা গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম মেটা-বাই সালফাইটের মত সাধারণ রাসায়নিক ব্যবহার করে চিনেমাটির বয়েম বা জারে ফুলকপি, শালগম, মটরশুটি, বা লাউ জাতীয় সব্জী মোম দিয়ে আটকানো ঢাকনার ভিতর সংরক্ষণ করা যায়। উদ্যোগী মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে এ ব্যাপারে উন্নত প্রযুক্তি গড়ে তুলতে পারেন। এই সব সব্জী ব্যবহারের আগে ৬ ঘণ্টা টাটকা জলে ভিজিয়ে রাখলে এদের তাজা স্বাদ ফিরে পাবে।

আর একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হল পশুখাদ্য (গরুর ও মুরগীর ফিড) প্রস্তুত। বড় বড় কোম্পানীর মুখাপেক্ষী না থেকে গ্রামের মানুষ সহজতর প্রযুক্তিতে এগুলি তৈরী করে নিতে পারেন অনেক সস্তায়।

এই ক্ষুদ্র বইয়ের একটাই উদ্দেশ্য। গ্রাম সংগঠক ও গ্রামীণ মানুষকে উপযুক্ত প্রযুক্তি রচনা ও ব্যবহারে আকর্ষিত করা। এটি বর্ণ পরিচয় মাত্র। প্রযুক্তির ব্যাকরণ কৌমুদী রচনার জন্য প্রয়োজন অধিকতর গুণী ও জ্ঞানী মানুষের ব্যাপকতর সমবেত প্রচেষ্টা। এই রচনার শেষে তাই সেই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে জানাই—

অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু ॥

এই রচনায় যেখান থেকে সাহায্য পেয়েছি :

(ক) প্রতিষ্ঠান :

(১) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন
৩৩, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন, কলিকাতা-১২
(বহু শিল্পের ব্রোসিওর দিয়ে সাহায্য করেছেন এরা।)

(২) গ্রাম সেবক ট্রেনীং সেণ্টার, নরেন্দ্রপুর, চব্বিশপরগণা।
(এ বইয়ে ব্যবহৃত সমস্ত ফটোগ্রাফ তাঁদের সংগ্রহ থেকে নেওয়া। ছবি তুলেছেন নিতাই কর্মকার।)

(খ) জ্ঞানী গুণীজন :

(১) শিবশঙ্কর চক্রবর্তী (প্রিন্সিপ্যাল), মাণিক মিত্র (ডেয়ারী ও পোলট্রি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), নিতাই কর্মকার (লাইব্রেরীয়ান) গ্রামসেবক ট্রেনীং সেণ্টার, নরেন্দ্রপুর।

(২) অসিতগোবিন্দ চক্রবর্তী, এ. আর, সেনগুপ্ত, কে. এল ত্রিপাঠি ও সত্যেন মাইতি ; কে. ভি. আই. সির অফিসার বৃন্দ।

(৩) পূজারিণী দত্ত (প্রায় সবগুলি নকশার কাঠামোই তৈরী করে দিয়েছেন তাঁর অবসর সময়ে) ও আরো অনেক, অনেক মানুষ।

(গ) পুস্তকাবলী :

(১) সমষ্টি উন্নয়ন—গোপাল চক্রবর্তী (২) বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্র সেন (৩) Geography of West Bengal—S. C. Bose. (৪) Heating and Air Cond.—Allen Warker. (৫) গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা—নারায়ণ সান্যাল (৬) Solar Heating and Cooling—David Clark (৭) Urban Pattern—Arthur galion (৮) কাঠ ও কাঠের কাজ—দ্বারিক ঘোষ (৯) জল সরবরাহ প্রযুক্তিবিদ্যা—নীহার সামন্ত (১০) গ্রামের বাড়ী—নারায়ণ সান্যাল (১১) মাছের চাষ—অমরনাথ রায় (১২) আধুনিক মৌমাছি পালন—সন্তোষ মুখোপাধ্যায় (১৩) গৃহিণীর অভিধান—বেলা দে (১৪) Code of Practice—Asbestos

Cement Ltd. (১৫) Latest Cottage Industry—D. H. Bedekar. (১৬) পারিবারিক পোল্ট্রি—শ্রীশান্ত (১৭) বাংলার চাষী—শান্তিপ্রিয় বসু (১৮) যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষিশিল্প (১৯) Year Book'79—I. C. C. (২০) গৃহীর গাইড—দুর্গা বসু (২১) Water Proof Readring for Mud walls—N. B. O. (২২) মাটি ও মাটির কাজ—ননী চক্রবর্তী (২৩) জীবিকার সন্ধানে—ডঃ এ. কে. ঘোষাল (২৪) বেকারদের শূকর পালন—ঐ (২৫) গাছ-গাছড়ায় অসুখ সারায়—দীননাথ সেন (২৬) দোরগোড়ায় ফলচাষ—শচীন্দ্রমোহন সেন (২৭) ক্ষেতের শাক সবজী—ডঃ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮) নিরাপদর লড়াই—দুর্গা বসু (২৯) Bee Keeping—M. C. Nainar এবং (৩০) নিম্নলিখিত সাময়িক ও দৈনিক পত্রের বিভিন্ন সংখ্যা—Invention, Design, Architects Trade Journal, Science Reporter ধনধান্যে, পোলট্রি, The Changing Scene, দেশ, আজকাল, Statesman এবং মালিনী।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

Property of
Library
Agricultural Experiment Station
Oregon State College
Corvallis, Oregon

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০

২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭·০০

৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০

৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০

৫। হাঁপানি রোগ/মনীশ চন্দ্র প্রধান/৪·০০

৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্তচৌধুরী/৯·০০

৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০

৮। ১০৩টী মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০

৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০

১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

১১। মানুষের মন/অরুণ কুমার রায়চৌধুরী/৪·০০

দশ টাকা